শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শুভদা

অখণ্ড



শুভদা

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

গঙ্গায় আগ্রীব নিমজ্জিতা কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরানী চোখ কান রুদ্ধ করিয়া তিনটি ডুব দিয়া পিত্তল-কলসীতে জলপূর্ণ করিতে করিতে বলিলেন, কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে।

ঘাটে আরো তিন-চারিজন স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল, তাহারা সকলেই অবাক হইয়া ঠাকুরানীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। পাড়াকুঁদুলি কৃষ্ণঠাকরুনকে সাহস করিয়া কোন একটা কথা জিজ্ঞাসা করা, কিংবা কোনরূপ প্রতিবাদ করা, যাহার তাহার সাহসে কুলাইত না। বিশেষতঃ যাহারা ঘাটে ছিল তাহারা সকলেই তাঁহা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা।

তাই বলচি বিন্দু, মানুষের কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে।

যে ভাগ্যবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল তাহার নাম বিন্দুবাসিনী। বিন্দু বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বৌ, সম্প্রতি বাপের বাটী আসিয়াছিল।

বিন্দু দেখিল কথাটা তাহাকেই বলা হইয়াছে, তাই সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন পিসীমা?

এই হারাণ মুখুজ্যের কথাটা মনে পড়ল। ভগবান যেন ওদের মাথায় পা দিয়া ডুবুচ্চেন।

বিন্দুবাসিনী বুঝল হারাণ মুখুজ্যেদের দুরদৃষ্টের কথা হইতেছে। সেও দুঃখিতা হইল। প্রায় একমাস হইল হারাণের পাঁচ-ছয় বৎসরের একটি ছেলের মৃত্যু হইয়াছিল। সেই কথা মনে করিয়া বলিল, ভগবান কেড়ে নিলে মানুষের হাত কি? আর জন্ম-মৃত্যু কার ঘরে নেই বল!

প্রথমে কথাটার অর্থ কৃষ্ণঠাকুরানী ভাল বুঝিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, আহা, মাসখানেক হল ছেলে মারা গেছে বটে! সেকথা নয় বিন্দু, সেকথা নয়; মরা-বাঁচা ভগবানের হাতই বটে, কিন্তু এটা—তুই বুঝি কিছু শুনিস নি মা?

বিন্দুবাসিনী কিছু বলিল না, কেবল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া পুনশ্চ বলিলেন, হারাণ মুখুজ্যের কথা বুঝি কিছু শুনিস নি?

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর আবার কিসের কথা?

আহা! তাই ত বলছিলাম মা, ভগবান যখন মারেন তখন এমনি করেই মারেন। কিন্তু পোড়ারমুখো মিন্‌সের জন্য ত কষ্ট হয় না, কষ্‌ট হয় সোনার প্রতিমে বৌটার কথা মনে হলে। হতভাগী ড্যাক্‌রার হাতে পড়ে ত একদিনের তরেও সুখী হ'ল না।

বিন্দু যেমন মুখপানে চাহিয়াছিল তেমনি রহিল, বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু ঠাকুরানীরও এত কথা নিরর্থক বলা হয় নাই; সেজন্য তিনি মূল কথাটা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ডালপালা ছড়াইতে ছিলেন তাহা সমাধা হইল। ঘাটে যতগুলি শ্রোতা ছিল কাহারও বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রহিল না। প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিল, হারাণ মুখুজ্যের এমন কি কথা হইতে পারে যাহা তাহারা জানে না, অথচ গ্রামের সকলেই জানে।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বিন্দু কহিল, পিসিমা, কথাটা কি শুনতে পাইনে?

পি। কেন পাবে না মা? কিন্তু এ ত আর সুখের কথা নয়—তাই বলতে ইচ্ছে করে না, যখনই মনে পড়ে তখনি যেন বুকের মাঝখানটা টনটন করে ওঠে। আহা, ভগবান অমন মেয়ের কপালেও এত কষ্ট লিখেছিলেন !

বি। কিসের কষ্ট?

পি। কষ্ট কি এক রকমের? কত রকমের কত কষ্ট কত যাতনা তা তোদের কি আর বলব?

বি। তবু শুনিই না পিসিমা?

পি। না এখন থাক। কিছুই চাপা থাকবে না, সকলেই শুনতে পাবে—পেয়েচেও। কিছু আগে আর কিছু পরে— তোরাও সবাই শুনতে পাবি।

বি। তুমিই বল না!

পি। না না, আর বলব না। পরের কথাতে আর থাকব না মনে করেচি।

বিন্দু হাসিয়া বলিল, পিসিমা, আমরা কি তোমার পর? আমি জানি তুমি আমাকে বলবেই।

পি। বিন্দু, গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে কি তবে মিথ্যা কথা বলব?

বি। কিসের মিথ্যে কথা? মিথ্যা কথা কি তোমাকে বলতে বলেচি?

পি। তবে কেমন করে বলা হয়? এই যে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললাম, পরের কথায় আর থাকব না।

কলহপ্রিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী চলিয়া গেলে সকলেই সকলের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কেহ কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, বিশেষ ঠাকুরানীকে এ পর্যন্ত কেহ কখনো কথা বলিতে গিয়া চাপিয়া যাইতে দেখে নাই। স্নান সমাপ্ত হইলে সকলেই আপন আপন বাটীতে প্রস্থান করিল।

বিন্দু বাটীতে আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া মাতার নিকট আসিয়া বসিল।

তিনি বলিলেন, বিন্দু, এতক্ষণ ধরে কি জলে পড়ে থাকে মা, অসুখ হলে কি হবে বল দেখি?

বি। কি আর হবে,—দু'দিন ভুগব।

বিন্দুর মাতা হাসিয়া বলিলেন, সোজা কথা, এর জন্যে আর ভাবনা কি!

বিন্দু বলিল, মা, হারাণ মুখুজ্যেদের আবার কি হয়েছে?

মা। কি আবার হবে?

বি। আজ ঘাটে কৃষ্ণপিসিমার কথার ভাবে বোধ হয় তাদের নূতন কিছু একটা ঘটেচে। তুমি কিছু শোননি?

মা। কিছুই না। কি বললে?

বি। বললে যে হারাণ মুখুজ্যেদের ভগবান মাথায় পা দিয়ে ডুবুচ্চেন, কিন্তু পোড়ারমুখো মিন্‌সের জন্যে ত কষ্ট হয় না—কষ্ট হয় সোনার প্রতিমে বৌটার জন্যে। এইটুকু বলে, আর কিছু বললে না। বলে, পরের কথায় আর থাকব না।

মা। ঠাকরুনের এতদিনের পর ধর্ম্মজ্ঞান জন্মেচে!

বি। মা, সত্যি তুমি কিছু জান না?

মা। কিছু না।

বি। তবে আজ আমি দুপুরবেলা ওদের বাড়িতে যাব।

মা। কেন? কি দুর্ঘটনা ঘটেচে জানবার জন্যে?

বি। হ্যাঁ—

মা। তুই কি পাগল হয়েছিস? যে কথায় উনি থাকতে চাইলেন না, সেকথাটা তুই জিজ্ঞাসা করতে যাবি?

বি। উনি কে?

বিন্দুর মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, এই কৃষ্ণঠাকরুন।

বি। কৃষ্ণঠাকরুন কি আদর্শ, যে উনি যা না করবেন তা আর কাউকে করতে নেই?

মা। এসব বিষয়ে তা একরকম আদর্শ বৈ কি।

বি। তা হোক, আমি যাব।

মা। পরের কথায় না হয় নাই থাকলে?

বি।আচ্ছা, মা, একজন যদি ডুবতে থাকে, 'পরের কথায় কাজ নেই' বলে তাকে আর তুলতে নেই?

মা। তুই ত আর তুলতে যাচ্ছিসনে বিন্দু?

বি। কে ডুবচে জানলে যাব বৈ কি!

বিন্দুর জননী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, বিন্দু, তোমার ওদের বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। হারাণ মুখুজ্যে লোক ভাল নয়, তোমার বাপের সঙ্গে ওর শত্রুতা আছে; তোমার কি ওদের বাড়ি যাওয়া ভাল দেখায়?

বি। হারাণ মুখুজ্যে লোক ভাল নয় তা আমি জানি, কিন্তু আমি ত আর তার কাছে যাচ্চি নে। তার স্ত্রীর কাছে যেতে দোষ কি? বেশ বুঝতে পাচ্চি ওদের কিছু একটা হয়েছে; আমরা পাড়া-প্রতিবেশী হয়ে যদি এসময় চোখ বুজে থাকি তা হলে শ্বশুরবাড়িতে আমার আর কেউ মুখ দেখবে না।

মা। অঘোরনাথ কি তোকে পাড়ায় পাড়ায় কার কি হল না হল দেখে বেড়াতে বলেচে যে, তুই ওদের বাড়ির সন্ধান না নিলে উনি আর তোর মুখ দেখবেন না? আর আমি তোর মা হয়ে বারণ কচ্চি সেটা কি শোনবার যোগ্য নয়?

বি। মা, আমাকে যেতেই হবে!

মা। গিয়ে কি শুনবে? হারাণ মুখুজ্যের কি হয়েচে তা বাড়ির কেউ জানে না।

বি। তুমি কি করে জানলে?

মা। তোমার বাপের কাছে শুনেছি।

বি। তবে কি হয়েছে বল।

মা। নন্দীদের তহবিল ভেঙ্গেচে বলে তারা হাজতে দিয়েছে।

বি। নন্দীরা কারা?

মা। বামুনপাড়ার জমিদার। তাদের কাছারিতে হারাণ মুখুজ্যে চাকরি করত।

বি। কত টাকা চুরি করেছে?

মা। প্রায় দু শ’ টাকা।

বি। কেউ জামিন হয়নি?

মা। কে আর হবে বল? গাঁয়ে তোমার বাবাকেই সকলে জানে এবং তিনিই কেবল জামিন হতে পারেন কিন্তু তাঁকে ত সে পোড়া মিন্‌সে শত্রু করে রেখেচে। এঁকে একবার জামিন হতে বলেছিল, কিন্তু স্বীকার হননি।

বিন্দু অনেকক্ষণ মৌন হইয়া কি চিন্তা করিল, পরে বলিল, দুপুরবেলা একবার ওদের বাড়ি যাব। এসে পর্যন্ত বউকে একদিনও দেখিনি।

বিন্দুর মাতা বিস্মিত হইলেন এবং কুপিত হইয়া বলিলেন, এত কথা শুনেও যাবি?

বিন্দু যেরূপ সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' বলিল, তাহাতে গৃহিণীর আর কথা কহা হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিন্দু পুনরায় কহিল, আমি ওদের বাড়ি গেলে কারও কোন ক্ষতি নাই। আমি এই বলি মা, পুরুষমানুষদের ঝগড়া মেয়েমহল পর্যন্ত না পৌঁছুলেই ভাল।

বেলা হইতেছে দেখিয়া গৃহিণী উঠিয়া গেলেন; যাইবার সময় বলিলেন, ইনি শুনলে বড় রাগ করবেন।

বি। যাতে না শুনতে পান এমনি করে যাব।

মা। নিশ্চয় শুনতে পাবেন।

বি। তুমি শোনালেই পাবেন।

মা। কিন্তু, শুনলে বড় রাগ করবেন।

বিন্দু অন্যমনস্কভাবে কহিল, বাপ-মা সন্তানের উপর রাগ করেন, আবার ভুলে যান, সেজন্য তুমি ভেব না মা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুখোপাধ্যায় পরিবার

এ স্থানটার নাম হলুদপুর। গ্রামটি যে জেলায় তাহা আর বলিয়া কাহাকেও ক্লেশ দিতে চাহি না, কারণ এস্থানে কাহাকেও কখনও যাইতে হইবে না। এখানে দেখিবারও কিছু নাই, শুনিবারও কিছু নাই, তবে যদি নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া থাকেন ত আমার বিবরণ পড়িয়া যতটা পারেন উপলব্ধি করিয়া লউন।

শুনিয়াছি এ গ্রামে পূর্বে অনেক ধনবান ব্যক্তির নিবাস ছিল এবং তাহা সম্ভবও, কারণ একে ত ইহা গঙ্গার উপরে স্থাপিত, তাহার উপর বহুকালের দুই-চারিটা জীর্ণ ভগ্ন শিবমন্দির, বেতবন ও শ্যাকুল ঝোপের মধ্যে অর্ধলুক্কায়িতভাবে মৌনব্রতধারী যোগী মূর্তির মত বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। দুই-একটা ঘাটবাঁধা পুষ্করিণীর মধ্যে গরুবাছুর চরিয়া বেড়াইতেছে তাহাও চোখে পড়ে। এই সকল দেখিয়া গ্রামের চিরদিন যে এমনি অবস্থায় কাটে নাই তাহা অনুমান হয়, কিন্তু এখন কেবল দশ-বিশ ঘর ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাটী, আর পঞ্চাশ-ষাট ঘর চাষাভুষার কুটীর আর জঙ্গল আর জঙ্গল, এবং তাহারই মধ্যে দিয়া কদাচিৎ দুই-এক ব্যক্তির যাতায়াতের পায়ে-হাঁটা পথ।

এই গ্রামেই শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী। বাটীটি দ্বিতল—পুরাতন ইষ্টক-নির্মিত। উপর তলায় দুটি এবং নিম্নে চারি-পাঁচটি ঘর। চতুর্দিকে একরাশ বাঁশঝাড়, দুই-চারিটা কদলীবৃক্ষের ঝাড়, গোটা-দুই বেলগাছ, গোটা-দুই আমগাছ—একটা কতবেল গাছ—ইহাই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস্তুভিটা ও পার্থিব সম্পত্তি।

হলুদপুরের অর্ধক্রোশ দূরে বামুনপাড়ার জমিদার নন্দীদের জমিদার-সরকারে মুখুজ্যে মহাশয় চাকুরি করিতেন। কুড়িটি টাকা মাহিনা পাইতেন, কিন্তু

ইহাতেই তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিত, এখন কিন্তু আর তাহাতে কুলায় না—সর্বদা অনটন, সর্বদা অভাব।

বাটীতে তাঁহার পোষ্যবর্গও অনেকগুলি; স্ত্রী, দুইটি পুত্র, দুইটি কন্যা, এক বিধবা বড় ভগিনী অর্থাৎ বাঙ্গালীর ঘরে সচরাচর যাহা থাকে তাঁহারও ছিল। যখন তিনি মাসে কুড়িটি মুদ্রা স্ত্রীর হাতে দিতেন, তখন তাঁহার সংসারে আজকালকার মত নিত্য দৈন্য নিত্য অভাব কেহই টের পায় নাই। স্ত্রী এবং বড়ভগিনী উভয়ে মিলিয়া সুশৃঙ্খলায় সংসার চালাইয়া যাইতেন, এখন তাহা করেনও না, সংসারের নিত্য অনটনও কিছুতেই ঘুচে না।

আজ চাউল নাই, আজ দাইল নাই, আজ কাষ্ঠ অভাবে রন্ধন হইতেছে না, নিত্য এ-নাই, ও-নাই, তা নাই-এ পড়িয়া মুখুজ্যে মহাশয় অসৎ উপায় উদ্ভাবন করিলেন অর্থাৎ সরকারি তহবিলের কিছু অংশ আপনার ব্যয়ে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বাসী হারাণবাবুকে প্রথমে কেহ সন্দেহ পর্যন্ত করিল না, কিন্তু এ উপায় অধিক দিন চলে না; ক্রমশঃ জমিদারের সন্দেহ হইতে লাগিল; সন্দেহ যখন গাঢ়তর হইয়া উঠিল তখন তিনি একদিন সমস্ত খাতাপত্র দেখিতে চাহিলেন; খাতায় অনেক ভুল, অনেক গোলমাল প্রকাশ পাইল ও সঙ্গে সঙ্গে চুরিও ধরা পড়িল। হারাণবাবু এযাবৎ বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন; জমিদার শ্রীভগবান নন্দী দয়ালু এবং ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হারাণবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, কত টাকা চুরি করিয়াছ?

তাহা জানি না।

জানি না? খাতাপত্র দেখিয়া বোধ হয় তিন হাজারের উপরও চুরি করিয়াছ—এত টাকা কি করিলে?

খরচ করিয়াছি।

খরচ ত করিয়াছ, কিন্তু চুরি করিলে কেন?

কুড়ি টাকায় আমার চলে না, কাজেই চুরি করিতে হয়।

কুড়ি টাকায় তোমার এতদিন চলিয়াছে, এখন না চলিবার কোন কারণ আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না; যা হোক, তাই বা আমাকে বল নাই কেন যে, তোমার কুড়ি টাকায় সংসার চলে না।

বলিলে কি আমাকে বেশি টাকা দিতেন?

হয়ত দিতাম, কিন্তু সেকথা যাউক; যা লইয়াছ তাহার অর্ধেক আমাকে ফিরাইয়া দিলে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।

কেমন করিয়া দিব, আমার কিছুই নাই।

তোমার কোন জমিজিরাত থাকে ত বিক্রয় করিয়া দাও।

জমিজিরাতের মধ্যে আমার একমাত্র ভদ্রাসন আছে, তাহাই বিক্রয় করে লউন।

তোমার স্ত্রী-পুত্র থাকিবে কোথায়?

গাছতলায়।

ভগবানবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া হারাণ মুখুজ্যের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, তোমার চক্ষু অত রাঙা কেন?

কেমন করিয়া জানিব?

তখন হারাণ মুখুজ্যেকে বিদায় দিয়া অন্য একজন আমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, হারাণ মুখুজ্যের বাটীর সংবাদ লইতে পার?

কি সংবাদ লইব?

এইরকম যে ওদের সাংসারিক অবস্থা কেমন, কেমন সম্পত্তি আছে, কোনরূপ দেনাকর্জ আছে কি না—এই সব।

এই লোকটি হারাণবাবুর অনেক কথা জানিত। সে বলিল, আমি যতদূর জানি, মুখুজ্যেমশায়ের সংসারের অবস্থা ভাল নহে, সম্পত্তিও বোধ হয় কিছুই নাই—তবে দেনাকর্জ আছে কি না বলিতে পারি না।

ভাল করিয়া সংবাদ লইয়া আমাকে জানাইও।

দুইদিন পরে সে বাবুকে জানাইল যে, সাংসারিক অবস্থা যতদূর মন্দ হওয়া সম্ভব মুখুজ্যেমশায়ের তাহা হইয়াছে, অন্যান্য সংবাদ পূর্বে যাহা বিদিত করিয়াছিল, সমস্তই সত্য।

ভগবানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, মুখুজ্যে কোনরূপ নেশাটেশা করে কি?

আজ্ঞা হাঁ, গাঁজা খান।

তাই সেদিন চোখ অত রক্তবর্ণ দেখিয়াছিলাম; আনুষঙ্গিক আর কোন দোষ আছে কি?

আমলা নতমুখে বলিল, শুনতে পাই আছে।

তবে এক কাজ কর—কাল কোর্টে গিয়া চুরির অপরাধে মুখুজ্যের নামে নালিশ করিয়া দিও—পুলিসকেও সংবাদ পাঠাইয়া দাও।

পরিশেষে ফল এই দাঁড়াইল যে, মুখুজ্যে মহাশয়কে পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে যাইতে হইল।

নিকট হইলেও হলুদপুরে একথা প্রায় কেহই জানিতে পারিল না ; তবে বিন্দুর পিতা ভবতারণ গাঙ্গুলী একথা জানিলেন; বোধ হয় নন্দীরাই তাঁহাকে এ ঘটনা জানাইয়াছিল। তিনি সম্ভ্রান্ত ও বর্ধিষ্ণু লোক, ইচ্ছা করিলে হারাণ মুখুজ্যেকে অনায়াসে হাজতমুক্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু কিছুই করিলেন না। সহায়-সম্বলহীন মুখুজ্যে মহাশয় হাজতগৃহেই পচিতে লাগিলেন। আর এক কথা—কলহপ্রিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী এ ঘটনা যে কেমন করিয়া শুনিয়াছিলেন, তাহা শুধু তিনিই বলিতে পারেন।

বৈশাখের দ্বিপ্রহর কালমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। এইসময় হারাণবাবুর বাটীর রন্ধনশালার বারান্দায় তাঁহার স্ত্রী ও বড়কন্যা ললনা মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে। দুজনেরই মুখ শুষ্ক, আজ একাদশী—ললনা বালবিধবা; আর তাহার জননী—তিনিও এখন পর্যন্ত কিছুই আহার করেন নাই।

ললনা বলিল, মা, আজো বোধ হয় বাবা আসবেন না। মেঘ করে আসছে, যদি জল হয় তাহলে রান্নাঘরে দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না; তুমি কেন একটু কিছু খেয়ে নাও না।

ললনার জননী বলিল, আরও একটু দেখি, তিনদিন আসেন নি—আজ যদি আসেন।

মা, বাবা এমনতর ত কখন করেন নি; তিনদিন আসেন নি—আজ যদি না আসেন? কি করব বল, ভগবান আছেন!

একাদশীর দিন রাসমণি (হারাণবাবুর বড় ভগিনী) বেলা করিয়া স্নান পূজা করিতেন; এখন নিত্যকর্ম সমাপ্ত করিয়া মালা ফিরাইতে ফিরাইতে নিকটে আসিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, বৌ, এখন পর্যন্ত খাসনি?

বৌ বিমর্ষভাবে কহিল, আরও একটু দেখচি।

আমার পিণ্ডি—আরও একটু দেখে কি হবে? ড্যাক্‌রা আজ এত বেলায় কি আর আসবে? দেখগে যা—গাঁজা খেয়ে ভোঁ হয়ে কোন মাগীর বাড়ি পড়ে আছে। উপবাস করিলে রাসমণির মেজাজটা একটু খিটখিটে রকমের হইয়া পড়িত; কেহ কোন কথা কহিল না দেখিয়া আরো একটু কুপিত হইয়া বলিলেন, মুখপোড়া কবে মরবে যে আমাদের হাড় জুড়োবে।

এবার ললনার আর সহিল না। দুঃখিতভাবে বলিল, পিসিমা, একাদশীর দিন গাল দিচ্চ কেন?

একাদশীর দিন গাল দিচ্চ কেন? কথাটা রাসমণির ভিতরে গিয়া পৌঁছুছিল। অন্তরে ব্যথা পাইলেন এবং রীতিমত লজ্জিত হইলেন; কিন্তু ছোট ললনা যে একথা বলিয়াছে ইহাতেই দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেলেন।—তুই সেদিনকার মেয়ে, বুড়োমাগীকে একাদশী-দ্বাদশী শেখাতে আসিস নে। তোরই বাপ হয়, আমার কি কেউ হয় না? বলিতে বলিতে রাসমণির নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিল—বাছা আমার তিনদিন বাড়ি আসেনি—বুকের ভিতর যে কি কচ্চে তা ইষ্টিদেবতাই

জানতে পাচ্চেন। অঞ্চল দিয়া একফোঁটা অশ্রু মুছিয়া, আমি বুড়োমানুষ, যদি একটি কথা বলি তাহলে তোরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে তার ভুল দেখিয়ে পাঁচটা কথা শুনিয়ে দিস।—কাজ নেই মা, আমি তোদের কোন কথায় আর থাকব না। তবে না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে বৌটা মরে যায়, তাই দুকথা বলতে হয়।

ললনা অতিশয় দুঃখিত হইল। তাহার একটা কথায় এত গভীর অর্থ এবং আনুষঙ্গিক ক্রন্দনাদির কারণ ঘটিতে পারে সে নিজেই জানিত না।—পিসিমা আমার ঘাট হয়েচে, এমন কথা আমি আর বলব না। বাস্তবিক কথাটা তাহার ভাল হয় নাই। তাহার জননীও বলিলেন, মা, বড় হয়েছ, সব কথা বুঝে বলতে পার না?

তাহার পর সকলের পীড়াপীড়িতে ললনার জননী কিঞ্চিৎ আহার করিলে, বিন্দুবাসিনী আপনার পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা প্রমীলার হাত ধরিয়া হারাণবাবুর বাটীতে প্রবেশ করিল।

সম্মুখেই রাসমণি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি দেখিতে পাইয়া বলিলেন, বিন্দু এদিকে আর আসে না।

বিন্দু অপ্রতিভ হইবার লোক নহে; সেও সহাস্যে বলিল, তুমিই কোন্ আমাদের ওদিকে যাও দিদি?

যাবার কি আর জো আছে বোন, ছোটছেলেটার ব্যারাম নিয়ে এক-পাও কোথাও নড়বার সাধ্যি নেই।

কি হয়েছে তার?

জ্বর, পিলে, পেটের অসুখ—কিছুই আর বাকি নেই।

বৌ কোথায়?

এই এতক্ষণে মুখে দুটো ভাত দিয়ে ওঘরে ছেলেটার কাছে গিয়ে বসেচে।

এত বেলা হল কেন?

হারাণের পথ চেয়ে, সে ত তিনদিন থেকে আর বাড়ি আসেনি। যদি আসে, আরো একটু দেখি—এই রকম করে এতটা বেলা হয়ে গেল।

বিন্দু সেস্থান হইতে চলিয়া আসিয়া যে ঘরে বৌ তাহার পীড়িত কনিষ্ঠ পুত্র মাধবের শিয়রে বসিয়া তাহাকে গল্প শুনাইতেছিল সেইখানে প্রবেশ করিল। মাধব হারাণ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র, সে আজ একবৎসর হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহায় পীড়িত, শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে। পীড়া তাহার এমন কিছু কঠিন নহে; রীতিমত চিকিৎসা হইতে পাইলে এতদিন আরোগ্য হইয়া যাইত, কিন্তু অর্থাভাবে কিছুতেই সুচিকিৎসা হইতে পাইতেছে না। সামান্য টোটকা ঔষধ, পাঁচন ও কুইনাইনের উপর ভর করিয়া সে কিছুতেই উঠিয়া বসিতে পারিতেছে না। শান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল চক্ষু দুটি জননীর মুখের পানে নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল, মা, বাবা আজ তিন-চারদিন আমাকে দেখতে আসেন নি কেন?

তিনি এখানে নেই।

কোথায় গিয়েচেন মা?

জননী অল্প ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, তোমার ওষুধ আনতে গেছেন।

বালক প্রফুল্ল হইয়া বলিল, মিষ্টি ওষুধ যেন আনেন, তেতো ওষুধ আমি আর খেতে পারিনে। দেখ মা, ভাল হয়ে আমার আগেকার মত আবার বেড়িয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আগ্রহে আবার বলিয়া উঠিল, মা, আমি ভাল হব ত?

জননীর চক্ষে জল আসিতেছিল; তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন, জগদীশ্বরের মনে কি আছে তিনিই জানেন, প্রকাশ্যে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বিন্দু তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া কহিল—কেন ভাল হবে না বাবা? আমি কাছে থেকে তোমাকে সারিয়ে দোব।

মাধব কিংবা তাহার জননী কেহই এ পর্যন্ত বিন্দুর আগমন লক্ষ্য করেন নাই, সহসা দুজনেই চমকাইয়া উঠিলেন।

বিন্দু শয্যায় উপবেশন করিয়া বলিল, শুভদা, খেয়েচিস ত?

হারাণবাবুর স্ত্রীর নাম শুভদা; বিন্দু তাহা অপেক্ষা কিছু ছোট হইলেও সম্মুখে নাম ধরিয়াই ডাকিত। শুভদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

তোর বড়মেয়ে কোথা?

বোধ হয় ওপরে আছে।

তবে একবার ডাক, বলিয়া নিজেই ডাকিল, ললনা—ও ললনা!

ললনা উপর হইতে বলিল, কেন?

একবার নেমে আয় ত মা!

ললনা আসিলে তাহার হাতে কন্যাকে দিয়া বলিল, প্রমীলাকে নিয়ে একবার ছোটভাইটির কাছে বসত মা, অনেকদিন পরে দেখা হ'ল; তোর মার সঙ্গে ওঘর থেকে দুটো কথা কয়ে আসি।

প্রমীলাকে ললনার হাতে দিয়া শুভদার হাত ধরিয়া বিন্দু একবারে উপরে আসিয়া বসিল। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, বৌ, হারাণদাদা আজ ক'দিন বাড়ি আসেন নি?

তিন দিন।

কেন আসেন নি কিছু জানিস কি?

না, কিছু না।

বিন্দুবাসিনীর কথার ভাবে তাহার ভয় করিতেছিল, পাছে সে কিছু একটা বলিয়া ফেলে। বিন্দুবাসিনী মৌন রহিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, শুভদাও ততক্ষণ ক্রমাগত ঘামিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর বিন্দু বলিল, শুভদা, ইচ্ছে থাকলেও এমন অনেক কথা আছে যা মিষ্টি করে বলা যায় না—জানিস ত?

শুভদা শুষ্কমুখে বলিল, জানি—কেন?

হারাণদাদা আজ তিন-চারদিন বাড়ি আসেন নি;—মনে কর্ যদি তাঁর সম্বন্ধেই কোন অশুভ কথা বলতে হয়।

শুভদার সমস্ত শরীর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল;—তিনি বুঝি বেঁচে নেই?

ও কি, কাঁপচিস কেন? কে বললে তিনি বেঁচে নেই?

বেঁচে আছেন?

বালাই, বেঁচে কেন থাকবেন না? বেঁচে আছেন, সুস্থ শরীরে আছেন।

সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া আছে শুনিতে পাইল, তথাপি শুভদা কথা কহিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে ম্লানমুখে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি?

সেই কথাই বলতে এসেছি, কিন্তু তুই অমন করলে কেমন করে বলি?

শুভদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, অমন আর করব না। কি হয়েচে, বল।

চুরি করেছেন বলে নন্দীরা হাজতে দিয়েছে।

হাজতে দিয়েচে? শুভদার সমস্ত মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল,—তবে কি হবে?

বিন্দুবাসিনী স্বাভাবিকস্বরে বলিল, কি আর হবে? খালাস করে আনতে হবে।

তা কি হয়?

হয় না ত কি হাজতে গেলেই লোকে জেলে যায়?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুভদা বলিল, বিন্দু, তোমার বাপের কাছে একবার যাব।

বিন্দু ঘাড় নাড়িল। সে জানিত শুভদার মুখ দেখিলে পাষাণ গলিবে, কিন্তু ভবতারণ গাঙ্গুলী গলিবে না। তাই অমত করিয়া বলিল, গিয়ে কি হবে?

আমাদের কেউ নেই; তিনি যদি দয়া করে কোন উপায় করে দেন।

যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন; হারাণদাদাতে বাবাতে চিরকাল শত্রুতা, তাই বাবার কাছে গেলে কোন ফল হবে না।

তবে উপায়?

উপায় আমি করে দোব। নাহলে কি শুধু এই খবরটাই দিতে এসেছি? কিন্তু আমি যা বলব তা করতে পারবে?

পারব।

যতই শক্ত হোক?

শুভদা দৃঢ়স্বরে বলিল, হাঁ।

তবে শোন, দু শ না তিন শ টাকা চুরি করেচেন বলে নন্দীরা তাঁর নামে নালিশ করেছে।

দু শ-তিন শ টাকা! শুভদার ভ্রম হইল, এত টাকা কি একসঙ্গে মানুষে চুরি করিতে পারে? আর চুরি করিলেই বা রাখিবে কোথায়?

এত টাকা, বিন্দু, তিনি কখন চুরি করেন নি।

না করে থাকেন ভালই, কিন্তু সেকথায় আমাদের কাজ নেই। এই টাকাটা নন্দীদের দিয়ে খুব অনুনয়-বিনয় করলে বোধ হয় ছেড়ে দিতে পারে।

কিন্তু তা কেমন করে হবে? এত টাকা আমি পাব কোথায়?

সেকথা আমি বলচি। বৌ, এখন লজ্জার সময় নয়; তুমি আমার এই বালা দু’ গাছা নিয়ে আজ রাত্রে নিজেই ভগবানবাবুর কাছে যাও; তার পর যা ভাল বোঝ করো।

শুভদা বিস্মিত হইয়া কহিল, তোমার বালা দু গাছা?

হাঁ, আমার বালা দু গাছা। এর দাম তিনশ চারশ টাকা হবে; এই দিয়ে সাধ্যিসাধনা করলে দয়া করে ছেড়ে দিতেও পারেন।

কিন্তু বিন্দু—

কিন্তু আবার কি? আগে স্বামীকে বাঁচাও, তারপর কিন্তু করো। এখন কি সঙ্কোচ করবার সময় বৌ? আর টাকা শোধ দেবারই বা ভাবনা কি, তোর ছেলে বড় হয়ে শোধ দেবে।

আজই যাব?

হাঁ—আজই।

কার সঙ্গে যাব?

তেমন কেউ বিশ্বাসী লোক আছে কি?

কেউ না।

তবে একলাই যাও। বরং একলা যাওয়াই ভাল; কেননা পাঁচজনে শুনলে পাঁচটা কথা বলতে পারে।

তবে আজ যাই।

হাঁ—আজই যাও। সন্ধ্যার পর একটা ময়লা কাপড় পরে মুখ ঢেকে যেও। কাল এমনি সময় আর একবার আসব।

যাইবার সময় শুভদার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিন্দু সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, ঈশ্বর করুন, সব যেন মঙ্গল হয়। তা নাহলে অন্য উপায়ও আছে—তুই কিছু ভাবিস নে।

তাহার পর অঞ্চল খুলিয়া পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া শুভদার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, বৌ, আমি তোর মার পেটের বোন। আমাকে কোন লজ্জা নেই, আপাতত এই টাকা নে—ছেলেটাকে কিছু কিনে দিস।

নিচে আসিয়া বিন্দু কন্যা প্রমীলার হাত ধরিয়া বলিল, বেলা গেল—চল মা, বাড়ি যাই। তাহার পর বিধবা ললনার উপর একটি সস্নেহ করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভগবানবাবুর দয়া

তখন দ্বিপ্রহরের সময়, যেসব মেঘ বাতাসের দৌরাত্ম্যে ছিন্নভিন্ন হইয়া পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা সন্ধ্যার পরেই একটির পর একটি করিয়া মহাসমারোহে বাজনা-বাদ্য বাজাইয়া আবার আকাশের গায়ে জোট বাঁধিতে লাগিল। সকলেই স্থির করিল আজ রাত্রে বৃষ্টি না হইয়া যায় না। গরম কমিবে—প্রাণ বাঁচিবে। এ বৃষ্টি সকলের মঙ্গলের জন্য, শুধু শুভদা মনে করিল তাহারই কপালদোষে আজ এই দুর্যোগের সূত্রপাত হইয়া আসিল। একে ত হলুদপুরের পথঘাট বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া, তাহাতে গাঢ় মেঘ করিয়াছে, তথাপি শুভদা বালা দু' গাছি অঞ্চলে বাঁধিয়া, কাপড়খানি বেশ করিয়া গুছাইয়া পরিয়া, একটা বিছানার চাদরে সমস্ত অঙ্গ বেশ করিয়া আবৃত করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে পূর্বে আর কখন বামুনপাড়ায় যায় নাই, শুধু শুনিয়াছিল মাত্র যে, উত্তরমুখ ধরিয়া চলিলে আধক্রোশ দূরে পাকারাস্তা পাওয়া যায় এবং আর একটু অগ্রসর হইলেই বামুনপাড়া। সেখানে পৌঁছতে পারিলে জমিদারবাড়ি চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইবে না। কারণ নন্দীদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা গ্রামে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় সে শুনিয়াছিল। হলুদপুরের অন্ধকার পথ ছাড়াইয়া পাকারাস্তা পাওয়াই তাহার বিপদের কথা হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া একফোঁটা দুইফোঁটা জল পড়িতে লাগিল; একফোঁটা দুইফোঁটা পরিশেষে মুষলধারায় পরিণত হইল দেখিয়া শুভদা বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পথ চলা আর অসম্ভব; অন্ধকারে একহস্ত দূরের পদার্থও আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। প্রবল বৃষ্টি ও তৎসঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রের শব্দে শুভদার ভিতর পর্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। সে দেখিল, চতুর্দিক হইতে বন্য জীবজন্তু ছুটিয়া আসিয়া সেই

বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে আসিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ মনুষ্যমূর্তি দেখিয়া সভয়ে চিৎকার ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতেছে। শুভদার সহসা মনে হইল, যদি চোর ডাকাইত কেহ আশ্রয় লইতে এইখানেই আসিয়া পড়ে? তাহা হইলে? তাহার প্রাণের ভয় হইল না, কিন্তু তদপেক্ষা মূল্যবান বালা দু গাছির জন্য ভয় হইল। স্বামীর নিষ্কৃতির কারণ, নিজের আশা-ভরসা সমস্তই এই বালা দু গাছি।

সত্রাসে শুভদা বৃক্ষতল ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সমস্ত শরীর কর্দমসিক্ত হইয়াছে, গাছপালার আঁচড়ে ও কণ্টকে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তথাপি শুভদা পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। এক নিমিষের তরে বৃষ্টির উপশম নাই। এক মুহূর্তের জন্য মেঘের শব্দের বিশ্রাম নাই, কোন্ মুখে কোথায় চলিয়াছে তাহারও স্থিরতা নাই, তথাপি বনবাদাড় সরাইতে সরাইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বোধ হইল যেন অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পথ সম্মুখে দেখা যাইতেছে। দ্বিগুন উৎসাহে হাঁটিয়া আসিয়া শুভদা দেখিল যথার্থই পাকাপথ পাইয়াছে। এখন কিন্তু অন্য কথা। যখন পথ পায় নাই তখন কেবল পথের ভাবনাই ভাবিয়াছিল, এখন কাজের কথা মনে হইতে লাগিল। এত রাত্রে কি করিয়া দেখা হইবে, দেখা হইলেই কি কার্যসিদ্ধি হইবে? সিদ্ধ হউক আর না হউক, এ দুর্যোগে বাটীই বা কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইবে? ক্রমে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল; কিছুদূর আসিয়াই প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও চতুর্দিক-সংলগ্ন রেলিং দেওয়া বাগান দেখিয়া বুঝিতে পারিল ইহাই নন্দীদের বাটী; কিন্তু কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে? আর প্রবেশ করিলেই বা তাঁহার সহিত এত রাত্রে কি করিয়া সাক্ষাৎ করিবে ! শুভদার কান্না আসিল; এখন কি হইবে? কি করিয়া বাড়ি যাইবে? পরিশ্রমে, অনাহারে, দুর্ভাবনায় সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, নন্দীদের বাটির সম্মুখে যে শিবমন্দির ছিল তাহারই বারান্দার উপর আসিয়া একেবারে শুইয়া পড়িল। তখন বৃষ্টি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই, তবে কমিয়া আসিয়াছিল। বৈশাখের মেঘ যেমন একমুহূর্তে গগন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তেমনিই একমুহূর্তে গগন ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যায়। এ

মেঘও দেখিতে দেখিতে আকাশের প্রান্তদেশে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, আবার চাঁদের আলোকে জগৎ অনেক শুভ্রশ্রী ধারণ করিল। শুভদা মনে করিল এইবার ফিরিয়া যাইবার সময় হইয়াছে। সিক্তবস্ত্র একটু গুছাইয়া লইবার সময় দেখিতে পাইল একজন বৃদ্ধ ভৃত্য হস্তে প্রদীপ লইয়া জমিদারবাটীর ফটক খুলিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহার নিকট যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায় এইরূপ একটা ক্ষীণ আশায় ভর করিয়া শুভদা প্রস্থান না করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দেখিল একজন স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু কোন কথা না কহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

বহুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া দেখিল স্ত্রীলোকটি এখনও সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছে, বৃদ্ধ প্রথমে অবগুণ্ঠন দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল, কোন ভদ্রঘরের স্ত্রী জলের ভয়ে এখানে আশ্রয় লইয়াছিল, এইবার চলিয়া যাইবে, কিন্তু এখনো সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে গা?

স্ত্রীলোকটি কোন কথা কহিল না। কোথায় যাবে বাছা?

শুভদার কথা বলিতে লজ্জা করিতেছিল; কিন্তু এখন মৃদুকণ্ঠে কহিল, জমিদারবাবুদের বাড়িতে।

জমিদারদের বাড়ি ত এই সামনেই; তবে সেখানে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

শুভদা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বৃদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারদের বাড়িতে কার কাছে যাবে?

বাবুর কাছে।

কোন্ বাবুর কাছে?

ভগবানবাবুর কাছে।

বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া বলিল, ভগবানবাবুর কাছে?

হাঁ।

তবে আমার সঙ্গে এস। বৃদ্ধ অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। শুভদা জ্যোৎস্নালোকে বৃদ্ধের পলিতকেশ সৌম্যমূর্তি দেখিয়া অসঙ্কোচে পশ্চাতে চলিতে লাগিল। ক্রমে ফটক পার হইয়া, বাগান পার হইয়া, একটা কক্ষের দ্বার খুলিয়া বৃদ্ধ ডাকিল, এই ঘরে এস।

শুভদা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চমৎকার সুসজ্জিত কক্ষ, সমস্ত মেঝের উপর মূল্যবান কার্পেট বিছানো; সম্মুখে মসলন্দ পাতা, তাকিয়া দেওয়া বসিবার স্থান। বৃদ্ধ তাহার উপর উপবেশন করিয়া শুভদার আপাদমস্তক দীপালোকে, অবগুণ্ঠনের ঈষৎ ফাঁক দিয়া যতদূর দেখা যায় নিরীক্ষণ করিল। শুভদা সময়ে রূপবতী ছিল। বয়সে ও দুঃখ-কষ্টে পূর্বের সে জ্যোতি এখন আর নাই, তথাপি হীনপ্রভ লাবণ্যের যতটুকু অবশিষ্ট আছে, বৃদ্ধ তাহাতেই মোহিত হইল। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া কহিল, বাছা, তোমার ভুল হইয়াছে, বিনোদবাবুর সঙ্গে বোধ হয় তুমি দেখা করিতে চাও।

বিনোদবাবু কে?

বিনোদবাবু ভগবানবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

শুভদা কহিল, তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহি না।

তবে কি ভগবানবাবুর নিকটই প্রয়োজন আছে?

হাঁ

ভগবান নন্দী আমারই নাম; কিন্তু আমি তোমাকে কখন দেখিয়াছি বলে ত মনে হয় না।

শুভদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তবে আমার নিকট কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

শুভদা কথা কহিল না।

ভগবানবাবু আবার বলিলেন, আমি ভাবিয়াছিলাম রাত্রে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন বিনোদের নিকটই থাকিতে পারে; এত রাত্রে আমার নিকট যে তোমার কি প্রয়োজন আছে আমি বুঝিয়া উঠিতে পারছি না।

তথাপি শুভদা কোনও উত্তর দিল না।

তোমার বাড়ি কোথায়?

হলুদপুরে।

হলুদপুরে? আমার নিকট প্রয়োজন? তুমি কি হারাণের স্ত্রী?

শুভদা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

তবে বল কি প্রয়োজন?

শুভদা অঞ্চল হইতে বালা দু গাছি খুলিয়া ধীরে ধীরে ভগবানবাবুর পায়ের নিকট রাখিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, তাঁকে ছাড়িয়া দিন।

বৃদ্ধ সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। বালা দু গাছি হাতে লইয়া বেশ পরীক্ষা করিয়া অবশেষে কহিলেন, তবুও সুখী হইলাম যে সে তোমাকে ইহাও দিয়েছিল। তাহার পর বালা দুটি নীচে রাখিয়া বলিলেন, তুমি ইহা ফিরাইয়া লইয়া যাও। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ের হাতের বালা লইতে চাহি না। ছাড়িয়া দিতে হয় অমনিই দেব; বিশেষ সে আমার যাহা লইয়াছে তাহাতে এ অলঙ্কার লইয়া ছাড়িয়া দেওয়াও যা, না লইয়া ছাড়িয়া দেওয়াও তা।

শুভদা চক্ষু মুছিয়া বলিল, তাঁকে ছাড়িয়া দিবেন ত?

ইচ্ছা ছিল না ! সে যেরকম দুশ্চরিত্র তাহাতে তাহার শাস্তি পাওয়াই উচিত ছিল, তবুও তোমার জন্য ছাড়িয়া দেব।

শুভদার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। পলিতকেশ বৃদ্ধকে সে ব্রাহ্মণকন্যা হইলেও মুখ ফুটিয়া আশীর্বাদ করিতে সাহস করিল না; মনে মনে তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিয়া ঈশ্বরের চরণে তাঁহার সহস্র মঙ্গল কামনা করিয়া

যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। ভগবানবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন, আজই বাড়ি যাবে?

শুভদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আজই যাইবে।

তোমার সঙ্গে আর কেহ লোক আছে?

কেহ না।

কেহ না? তবে এত রাত্রে একাকী যাইও না। একজন লোক লইয়া যাও।

শুভদা তাহাও অস্বীকার করিয়া একাকী সেই বনের ভিতর দিয়া বাটী ফিরিল।

যখন বাটীতে প্রবেশ করিল তখন ভোর হইয়াছে। ললনা ইতিপূর্বে উঠিয়া সংসারের কাজকর্ম করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সিক্তবস্ত্রে জননীকে দেখিয়া কহিল, মা, এত ভোরে স্নান করে এলে?

হাঁ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রামমণি ও দুর্গামণি নাম না রাখিয়া যে শুভদা কন্যা দুইটির নাম ললনা ও ছলনা রাখিয়াছিল, তাহাতে ঠাকুরঝি রাসমণির আর মনস্তাপের অবধি ছিল না।

বাজারের তাদের মত ললনা ছলনা নাম দুটা অষ্টপ্রহর তাঁর কর্ণে বিঁধিতে থাকিত। ললনা নামটা তবু কতক মাফিকসই; কিন্তু ছিঃ—ছলনা আবার কি নাম ! ছলনাকে না দেখিতে পারার কারণ অর্ধেক তার ঐ নামটা। লোকে ঠাকুরদের নামে ছেলেমেয়ের নাম রাখে ; কেননা, তাদের ডাকিতেও ভগবানের নাম করা হয়, কিন্তু এ দুটো মেয়েকে ডাকলে যেন পাপের ভার একটু একটু করে বাড়ছে মনে হয়।

ললনাময়ী, ছলনাময়ী হারাণবাবুরই দুই কন্যা। একজন বড়, একজন ছোট; একজন সপ্তদশবর্ষীয়া, একজন একাদশবর্ষীয়া; একজন বিধবা, একজন অনূঢ়া।

এই ত গেল পরিচয়ের কথা। এখন রূপ-গুণের কথা, তাহা আমি বলিতে পারিব না। তবে গঙ্গার ঘাটে ললনা স্নান করিতে যাইলে বর্ষীয়সীরা বলাবলি করিতেন, ঠাকুর বিধবা করিবেন বলেই ছুঁড়ির এত রূপ দিয়েছিলেন ! ললনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ডুব দিতে থাকিত। সমবয়স্কারা কানাকানি করিত। কি বলিত তাহারাই জানে, তবে ভাবে বোধ হয় বিশেষ প্রশংসা করিত না। ললনার তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সে বেশি কথাও কহিত না, বেশি কথায় থাকিতও না—দুই-চারিটা কথা কহিত, স্নান করিত, জল লইত—উঠিয়া বাটী চলিয়া আসিত। কিন্তু ছলনার স্বতন্ত্র কথা। সে অধিক কথা কহিতে ভালবাসিত, অধিক কথায় থাকিতে ভালবাসিত, আটটার সময় স্নান করিতে গিয়া এগারটার কম বাটী

ফিরিয়া আসিত না, গায়ে গহনা নাই বলিয়া মুখ ভারী করিত, মোটা চালের ভাত খাওয়া যায় না বলিয়া কলহ করিত, পাতে মাছ নাই কেন বলিয়া থালাসুদ্ধ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত; এইরূপে দিনের মধ্যে শতসহস্র কাজ করিত। তাহারও শরীরে রূপ ধরে না। তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণ, গোলাপপুষ্পের মত মুখখানি। তাহাতে ভ্রূদুটি যেন তুলি দিয়া চিত্রিত করা, পাতলা দুখানি ঠোঁট পান খাইয়া লাল করিয়া দর্পণ লইয়া নির্জনে ছলনাময়ী আপনার রূপ দেখিয়া আপনি গৌরবে ভরিয়া উঠিত।

মনে মনে বলিত, এই বয়সে এত রূপ, না জানি বয়সকালে কি হবে! সমস্ত অঙ্গে কত গহনা থাকিবে; এইখানে বালা, এইখানে অনন্ত, এইখানে বাজু, এইখানে হার, চিক, কণ্ঠমালা, সাতনরি, দশনরি, বিশনরি, আরও কত কি—উঃ, তখন কি হবে ! এ আনন্দ ছলনা একা বহিতে পারিত না—ছুটিয়া দিদির কাছে আসিয়া বসিত।

ললনা জিজ্ঞাসা করিত, কি লা? ছুটছিস কেন?

দিদি আমার রঙটা কি আগেকার চেয়ে কালো হয়ে গেছে?

কালো হবে কেন?

হয় নি? আচ্ছা দিদি, আমাদের গাঁয়ে কেউ গুণতে জানে কি?

কেন?

আমি হাত দেখাব।

কেন?

তারা গুণে বলে দেবে, বড় হলে আমার গয়না হবে কি না।

ললনার চক্ষে জল আসিত।—হবে দিদি হবে, তুই রাজরানী হবি।

ছলনার লজ্জা করিত। মুখখানি লাল করিয়া ছুটিয়া অন্যত্র পলাইয়া যাইত। গহনা হইবে কি না তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিল; রাজরানীর কথা কে বলিয়াছে?

কখন আসিয়া হয়ত জিজ্ঞাসা করিত, দিদি, আমাদের কিছু নেই কেন?

ললনা বলিত, আমরা দুঃখী তাই।

কেন দুঃখী দিদি? গাঁয়ে কে আমাদের মত এমন করে থাকে, এমনতর কষ্ট পায়?

ঈশ্বর যাকে যেমন করেছেন তাকে তেমনি করেই থাকতে হয়।

ঈশ্বর কাউকে এমন করলেন না, কেবল আমাদেরই এমন করলেন?

আমাদের পূর্বজন্মের পাপ।

কি পাপ দিদি?

পাপ কি একরকম আছে বোন? হয়ত কত অকর্ম করেছি। বাপ-মাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিনি, লোকের মনে অযথা ক্লেশ দিয়েছি—আরো কত কি হয়ত করেছি।

ছলনার মুখ ম্লান হইল। বলিল, এমনি করেই তবে কি চিরকাল কাটবে? কখন কি সুখ হবে না?

তা কেন ভাই, দুর্দিন কেটে গিয়ে আবার সুদিন হবে। তাহার পর ছলনার হাত দুটি সস্নেহে আপনার হাতে লইয়া বলিত, দেখিস দেখি—তোর কত সুখ হবে; কত ঐশ্বর্য, কত গহনা, কত দাসদাসী—তুই রাজরানী হবি।

ললনা একথাটা যখন তখন বলিত। ছলনা না ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা কথা বলিয়া ফেলিল, দিদি তুমি?—

সে জানিত তাহার দিদি বিধবা, তথাপি বালিকাসুলভ চপলতায় একটা কথা আপনা আপনি মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাই ছলনা অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল।

ললনা মৃদু হাসিয়া বলিল, আমিও সুখে থাকব বোন—ঐ আমাকে মা ডাকছেন।

ললনা চলিয়া গেল। যথার্থই মা তখন ডাকিতেছিলেন। কাছে আসিয়া বলিল, কেন মা?

তোমার বাবা এসেচেন, ঐ ঘরে—

কথা শেষ হইবার পূর্বেই ললনা চলিয়া গিয়াছে।

আহার করিতে বসিলে রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন কোথায় ছিলে?

মুখে গ্রাস তুলিয়া হারাণবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, সে অনেক কথা!

রাসমণি মুখব্যাদান করিলেন, অনেক কথা কি রে?

সে গ্রাস গলাধঃকরণ করিয়া হারাণবাবু পূর্বমত গম্ভীরমুখেই বলিলেন, অনেক কথা এই যে, মাথার উপর দিয়ে প্রলয়ের ঝড় বয়ে গিয়েছে।

রাসমণির বিস্ময়ের সীমা নাই, ভাবনার শেষ নাই; প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, খুলেই বল হারাণ।

হারাণ গম্ভীরমুখে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিয়া কহিল, নষ্টচন্দ্রের কলঙ্কের কথা জান? আমার তাই হয়েছিল। চুরি করেছি বলে নন্দীরা আমাকে—না, আমার নামে নালিশ করেছিল।

নালিশ করেছিল?

হাঁ, নালিশ করেছিল; কিন্তু মিছে কথা কতক্ষণ থাকে? কিছুই প্রমাণ হ'ল না—আজ মকদ্দমা জিতে তাই বাড়ি আসচি।

ঘোমটার অন্তরালে শুভদা চক্ষু মুছিল। রাসমণি নন্দীদের বহু মঙ্গল কামনা করিলেন, তাহাদিগকে সগোষ্ঠী মুক্তি দিবার জন্য দুর্গার চরণে অনুযোগ করিলেন; তাহার পর বলিলেন, কিন্তু ওরা চাকরিতে তোকে আর রাখবে কি?

হারাণবাবু চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেন—চাকরিতে রাখবে? আমি করলে তবে ত রাখবে? হারামজাদা ভগবান নন্দীর এজন্মে আমি আর মুখ দেখব? যদি বেঁচে

থাকি ত প্রতিশোধ নেব—আমাকে যেমন অপমান করেচে, তার শোধ তুলবই তুলব!

রাসমণি কিছুক্ষণ ভয়বিস্মিত চক্ষে বীর ভ্রাতার পানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু বলিলেন, তাহলে কিন্তু খরচপত্রের—

সে ভাবনা ভেব না দিদি—বেটাছেলে, আমার ভাবনা কি? কালই আর এক জায়গায় চাকরি জুটিয়ে নেব।

হারাণবাবুর কথা যে রাসমণি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন, তাহা নহে, তথাপি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশ্বাস করিয়া এ দারুণ দুর্ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে এসময়ে সকলেরই ইচ্ছা হয়। রাসমণিও তাহাই করিলেন। মনকে প্রবোধ দিলেন, হয়ত সে যাহা বলিতেছে তাহাই করিবে; এ বিপদের সময়ও অন্ততঃ চক্ষু ফুটিবে। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, যা ভাল হয় তাই করিস— নাহলে, অসুখ-বিসুখ, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বিপদের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

একটা লম্বাচওড়া উত্তর দিয়া হারাণচন্দ্র আহার শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

এইবার মাধবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে শুনিয়াছিল পিতা আসিয়াছেন তাই এতক্ষণ উন্মুখ হইয়া শয্যার উপর বসিয়াছিল। হারাণবাবু নিকটে আসিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইয়া বলিলেন, কেমন আছ মাধব?

আজ ভাল আছি বাবা; তুমি এতদিন আসনি কেন?

হারাণচন্দ্র একটা মনোমত উত্তর খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু মাধব সেজন্য অপেক্ষা করিল না। আবার বলিল, তুমি আমার জন্য ওষুধ আনতে গিয়েছিলে, না? ওষুধ এনেচ?

হারাণচন্দ্র শুষ্কমুখে বলিলেন, এনেছি।

ভাল ওষুধ? খেলেই ভাল হব?

হবে বৈ কি।

বালক প্রফুল্ল হইয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, তবে দাও।

হারাণচন্দ্র বিপদে পড়িলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, এখন নয়, রাত্রে খেও।

বালক তাহাতেও সন্তুষ্ট। মৃদু হাসিয়া বলিল, তাই খাব। তাহার পর কিছুক্ষণ পিতার মুখপানে চাহিয়া বলিল, বাবা, আমাকে একটা ডালিম কিনে দিও—দেবে?

হারাণচন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, দিবেন।

তাহার পর শুভদা আসিলে তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকে আনা দুই পয়সা দিতে পারো?

কেন?

আমার দরকার আছে—একজনের ধার আছে, সে চাইতে এসেছে।

শুভদা বাক্স খুলিয়া দুই আনা পয়সা বাহির করিল। হারাণচন্দ্র উঁকি দিয়া দেখিলেন বাক্সে আরো অনেকগুলি পয়সা আছে। হাত পাতিয়া দু' আনা পয়সা লইয়া বলিলেন, থাকে ত আরো আনা চারেক পয়সা দাও—মাধবকে একটা বেদানা কিনে দেব।

শুভদা কাতরভাবে স্বামীর মুখপানে একবার চাহিল। এতগুলি পয়সা একসঙ্গে বাহির করিয়া দিতে বোধ হয় তাহার ক্লেশ হইতেছিল। তাহার পর বাক্স খুলিয়া বাহির করিয়া দিল।

পয়সাগুলি হাতে বেশ করিয়া গুছাইয়া লইয়া হারাণচন্দ্র একটু জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কালই আমি এসব শোধ করে দেব।

শুভদা অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়িল। সে বিলক্ষণ জানিত, তাহার স্বামীর অর্দ্ধেক কথার কোন অর্থই থাকে না। এখন চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া শুভদা বলিল, এখন কোথাও যেয়ো না—একটু শুয়ে থাক।

হারাণচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন—তা কি হয়? ঘরে বসে থাকলে কি আমার চলে? রাজ্যের কাজ আমার মাথার উপর পড়ে আছে।

তবে যাও—

তিনি চলিয়া যাইলে শুভদা বাক্স খুলিল। আর একটি টাকা মাত্র আছে। বিন্দুবাসিনী সেদিন যাহা দিয়া গিয়াছিল তাহা ফুরাইয়া আসিয়াছে। এই একটি টাকা মাত্র তাহাদের সম্বল। শুভদা বাক্সের একটি নিভৃত কোণে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া মাধবের কাছে আসিয়া বসিল।

মা, কখন বাবা বেদানা আনবেন?

সন্ধ্যার সময়।

সন্ধ্যা আসলি, রাত্রি হইল—তথাপি হারাণবাবুর দেখা নাই। মাধব অনেকবার খোঁজ লইল, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল; তাহার পর কাঁদিতে লাগিল।

শুভদা কাছে আসিয়া বসিল। ললনা অনেক করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিল; প্রথমে সে কিছুতেই ভুলিতে চাহে না, অবশেষে শ্রান্তমনে অবসন্ন শরীরে অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি ভোর না হইতেই সে আবার উঠিয়া বসিল—মা, আমার ডালিম এসেচে?

শুভদা চক্ষের জল চাপিয়া বলিল, ডালিম তোমাকে খেতে নেই।

কেন?

খেলে অসুখ হবে।

সে উঠিয়া বসিয়াছিল, আবার শুইয়া পড়িল।

পরদিন দ্বিপ্রহর অতীত হইলে হারাণচন্দ্র বাটী আসিলেন। রাসমণি রাগ করিয়া একটা কথাও কহিলেন না। ললনা পা ধুইবার জল আনিয়া দিল, স্নান করিবার উপকরণ, হুঁকাতে জল ভরিয়া তামাকু সাজিয়া দিল। হারাণচন্দ্র স্নানাহ্নিক

সমাপ্ত করিয়া আহার করিলে, শুভদা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—মাধবের বেদানা এনেচ?

ঐ যা—আহা-হা—পকেটে পয়সাগুলো রেখেছিলাম, ছেঁড়া পকেট,—সমস্ত পয়সা কোথায় পড়ে গেছে। থাকে ত আজ গণ্ডাচারেক পয়সা ধার দিও, সন্ধ্যার সময় তোমাকে সমস্‌ত ফিরিয়ে দেব।

শুভদা ম্লানমুখে বলিল, আর কিছু নেই।

হারাণচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, তা কি হয়? তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফুরোয় না।

শুভদা মনে মনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা স্মরণ করিল। প্রকাশ্যে বলিল, সত্যি কিছু নেই।

কেন থাকবে না? কাল যে দেখলাম অনেকগুলো পয়সা আর একটা টাকা আছে।

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

হারাণবাবু আবার বলিলেন, ছিঃ! আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে তোমার বিশ্বাস হয় না? সমস্ত টাকাটা দিয়ে বিশ্বাস না হয়, আনা চারেক পয়সারও বিশ্বাস রাখতে হয়।

আর আপত্তি করিল না, শুভদা হাত ধুইয়া প্রার্থিত অর্থ বাহির করিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অর্থের সদ্ব্যবহার বটে ! হারাণচন্দ্র হলুদপুর গ্রাম পার হইয়া বামুনপাড়ায় আসিলেন। তাহার পরে একটা গলিপথ ধরিয়া একটা দরমাঘেরা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এখানে অনেকগুলি প্রাণী জড় হইয়া এককোণে বসিয়াছিল। হারাণচন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাহারা সাহ্লাদে মহাকলরব করিয়া উঠিল। অনেক প্রীতিসম্ভাষণ হইল; কেহ বাবা বলিয়া ডাকিল, কেহ দাদা বলিয়া ডাকিল, কেহ খুড়ো, কেহ মামা, কেহ মেসো ইত্যাদি বহুমান্যে বহুসম্ভাষিত হইয়া মুরুব্বির মত হারাণচন্দ্র তন্মধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন।

অনেক কথা চলিতে লাগিল। অনেক রাজা-উজিরের মুণ্ডপাত করা হইল, অনেক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করা হইল। এটা গুলির দোকান। সংসারের একপ্রান্তে শ্মশান, আর অপরপ্রান্তে গুলির দোকান। শ্মশানে মহারাজাও ভিক্ষুকের সমান হইয়া যান, এখানেও ভিক্ষুক মহারাজার সমান হইয়া দাঁড়ান। টানে টানে অহিফেন মগজে যত জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিতে লাগিল, হৃদয়ের মহত্ত্ব, শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য, গাম্ভীর্য, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি একে একে তেমনি ফাঁপিয়া ফুলিয়া প্রশস্ত হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। কত দান, কত প্রতিদান! মণি,মুক্তা, হীরক, কাঞ্চন, কত রাজ্য, কত রাজকন্যা ; টানে টানে অবাধে ভাসিয়া চলিতে লাগিল। একাধারে এত রত্ন, জগতের তাবৎ বাঞ্ছিত বস্তু অর্ধ আলোকে, অর্ধ আঁধারে, দরমার ঘরে, ভূতলে, সে ইন্দ্রসভা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া অনেকগুলি কালিদাস, অনেকগুলি দিল্লীর বাদশাহ, অনেকগুলি নবাব সিরাজদ্দৌল্লা, অনেকগুলি মিঞা তানসেন একে একে ঝাঁপ খুলিয়া বাহিরে আসিতে লাগিলেন। জগতের নীচ লোকের সহিত তাঁহারা মিশিতে পারেন না,

কথাবার্তা আলাপ-পরিচয় করা শোভা পায় না, কাজেই তাঁহারা রাস্তার একপাশ ধরিয়া নিঃশব্দে স্ব স্ব প্রাসাদ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

হারাণচন্দ্রও তাঁহাদের মত বাহিরে আসিলেন; কিন্তু বাহিরে আসিয়া তাঁহার একটু বিভ্রাট ঘটিল। কোথা হইতে সেই হতভাগ্য পীড়িত মাধবের মুখখানা মনে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বেদানার কথাটাও স্মরণ হইল। অপর সকলের মত তিনিও অবশ্য কোন একটা বিশেষ উচ্চপদ লাভ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু মুখপোড়া ছোঁড়ার মুখখানা সে রাজ্যে বিষম বিশৃঙ্খল ঘটাইয়া দিল।

দিল্লীর বাদশা পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন, রাজকোষ প্রায় শূন্য। অতবড় সম্রাটের চারিটি পয়সা ও একটি গাঁজার কলিকা ভিন্ন আর কিছুই নাই। বহুৎ আচ্ছা ! তাহাই সহায় করিয়া তিনি নিকটবর্তী একটা গঞ্জিকার দোকানে প্রবেশ করিলেন।

অধিকারীকে মিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন, খুড়ো, চার পয়সার তামাক দাও ত।

অধিকারী সে আজ্ঞা সত্বর সম্পাদন করিল।

হারাণচন্দ্র তখন মনোমত একটা বৃক্ষতল অন্বেষণ করিয়া লইয়া গঞ্জিকা-সাহায্যে বিশৃঙ্খল রাজত্ব পুনরায় শৃঙ্খলিত করিয়া লইলেন।সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইলে রাত্রি অনেক হইতেছে দেখিয়া বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। অনেকদূর গিয়া একটা খোড়ো বাড়ির সম্মুখের দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিলেন, কাত্যায়নী !

কেহ উত্তর দিল না।

আবার ডাকিলেন, বলি কাতু বাড়ি আছ কি?

তথাপি উত্তর নাই।

বিরক্ত হইয়া হারাণচন্দ্র চিৎকার করিয়া ডাকিলেন, বলি বাড়ি থাক ত দরজাটা একবার খুলে দিয়ে যাও না।

এবার অতি ক্ষীণ রমণীকণ্ঠে জবাব আসিল, কে?

আমি—আমি

আমার বড় শরীর অসুখ—উঠতে পারব না।

তা হবে না। উঠে খুলে দাও।

এবার একজন পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয়া কালোকোলো মোটাসোটা সর্বাঙ্গে উল্কিপরা মাননসই যুবতী যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতে করিতে আসিয়া খট করিয়া দ্বার মোচন করিল।

উঃ মরি—যে পেটে ব্যথা ! অত ষাঁড়-চেঁচাচ্চ কেন?

চেঁচাই কি সাধে? দোর না খুললেই চেঁচামেচি করতে হয়।

যুবতী বিরক্ত হইল—না বাবু, অত আমার সইবে না। আসতে হয় একটু সকাল সকাল এসো। রাত্তির নেই, দুপুর নেই, যখন-তখন যে অমনি করে চেঁচাবে—তা হবে না, অত গোলমাল আমার ভাল লাগে না।

হারাণচন্দ্র ভিতরে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিলেন। তাহার পর কাত্যায়নীর পানে চাহিয়া বলিলেন, আহা ! পেটে ব্যথা হয়েছে, তা ত আমি জানিনে।

তুমি কেমন করে জানবে? জানে পাড়ার পাঁচজন। কাল থেকে এখন পর্যন্ত পেটে একবিন্দু জলও যায়নি। তা এত রাত্তিরে কেন?

একটু কাজ আছে।

কাজ আবার কি?

বলছি। তুমি একটু তামাক সাজ দেখি।

রমণী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া হাত দিয়া ঘরের একটা কোণ দেখাইয়া বলিল, ঐ কোণে সব আছে। তামাক খেতে হয় নিজে সেজে খাও, আমাকে আর জ্বালাতন করো না—আমি একটু শুই।

হারাণচন্দ্র অপ্রতিভভাবে কহিল, না না, তোমাকে বলিনি—আমার মনে ছিল না, তুমি শুয়ে থাক, আমিই সেজে নিচ্চি।

তখন তামাকু সাজিয়া হুক্কা হস্তে হারাণচন্দ্র কাত্যায়নীর পার্শ্বে শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ তামাকু সেবন করিবার পর, ধীরে ধীরে—অতি ধীরে, বড় মৃদু—পাছে গলার স্বর কর্কশ শুনায়, কহিলেন, কাতু, আজ আমাকে গোটা-দুই টাকা দিতে হবে।

কাত্যায়নী কথা কহিল না।

বলি শুনলে? ঘুমুলে কি? আজ আমাকে দুটো টাকা দিতেই হবে।

কাত্যায়নী পার্শ্ব পরিবর্তন করিল, কিন্তু কথা কহিল না।

হারাণচন্দ্র একটু সাহস পাইলেন। হুক্কাটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তাহার গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন, দেবে ত?

কাত্যায়নী কথা কহিল, মিছে ভ্যানভ্যান করচ কেন? কোথা থেকে দেব?

কেন, তোমার নেই কি?

না।

আছে বৈ কি! বড় দরকার; আজ এ দয়া আমাকে করতেই হবে।

থাকলে ত দয়া করব।

দুটো টাকা তোমার আছেই। আমি জানি আছে। টাকা অভাবে বাড়িতে আমার খেতে পাচ্চে না, আমার রোগা ছেলের মুখের খাবার কেড়ে খেয়েছি; লজ্জায় ঘৃণায় আমার বুক ফেটে যাচ্চে। কাতু, আজ আমাকে বাঁচাও—

থাকলে ত বাঁচাব? আমার একটি পয়সাও নেই।

এইবার হারাণচন্দ্রের ক্রোধ হইল। বলিলেন, কেন থাকবে না? এত টাকা দিলাম, আর আমার অসময়ে দুটো টাকাও বেরোয় না? চাবিটা দাও দেখি, সিন্দুক খুলে দেখি টাকা আছে কি না।

কাত্যায়নীর আঁতে ঘা লাগিল। একটা অবাচ্য অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিয়া বসিল। ক্রোধদৃপ্তলোচনে হারাণের মুখের উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, কেন, তুমি কে যে তোমাকে সিন্দুকের চাবি দেব? সে ছোটলোকের মেয়ে, নীচ কথা তাহার মুখে বাধে না। অনায়াসে চিৎকার করিয়া বলিল, যখন রেখেছিলে তখন টাকা দিয়েছিলে, তা বলে তোমার দুঃসময়ে কি সেসব ফিরিয়ে দেব?

হারাণচন্দ্র একেবারে এতটুকু হইয়া গেলেন। কাত্যায়নীর মুখের সম্মুখে তিনি কখনই দাঁড়াইতে পারেন না, আজও পারিলেন না। নিতান্ত নরম হইয়া বলিলেন, তবু ভালবেসেও ত একটু উপকার করতে হয়?

ছাই ভালবাসা। মুখে আগুন অমন ভালবাসার। আজ তিনমাস থেকে একটি পয়সা দিয়েচ কি যে ভালবাসব?

ছিঃ! অমন কথা বোলো না কাতু, ভালবাসা কি নেই?

এক তিলও না। আমাদের যেখানে পেট ভরে সেইখানে ভালবাসা। এ কি তোমার ঘরের স্ত্রী যে গলায় ছুরি দিলেও ভালবাসতে হবে? তোমা ছাড়া কি আমার গতি নেই? যেখানে টাকা সেইখানে আমার যত্ন, সেইখানে আমার ভালবাসা। যাও, বাড়ি যাও—এত রাত্তিরে বিরক্ত করো না।

কাতু, সব কি ফুরোলো?

অনেকদিন ফুরিয়েচে। এতদিন চক্ষুলজ্জায় কিছু বলিনি। আজ যখন কথা পাড়লে তখন সমস্ত স্পষ্ট করেই বলি; তোমার স্বভাব-চরিত্র খারাপ—আমার এখানে আর এস না। বাবুদের টাকা চুরি করে জেলে যাচ্ছিলে—চাকরি-বাকরি নেই, কোন্‌দিন আমার কি সর্বনাশ করে ফেলবে—তার চেয়ে আগেভাগে পথ দেখাই ভাল। এখানে আর ঢুকো না।

হারাণচন্দ্র বহুক্ষণ সেইখানে সেই অবস্থায় মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, তাই হবে। এখানে আর আসব না। তোমার জন্যে আমার সব হল; তোমার জন্যে আমি চোর, তোমার জন্যে আমি লম্পট, তোমার জন্যে আমি স্ত্রী-পুত্র দেখি না, শেষে তুমিই—

হারাণচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, আজ আমার চোখ ফুটলো

এবার কাত্যায়নীও নরম হইল। একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, ঠাকুর করুন তোমার যেন চোখ ফোটে। আমরা ছোটলোকের মেয়ে, ছোটলোক—কিন্তু এটা বুঝি যে, আগে স্ত্রী-পুত্র বাড়িঘর, তারপর আমরা ; আগে পেটের ভাত, পরবার কাপড়, তার পর শখ, নেশা-ভাঙ। তোমার আমি অহিত চাইনে, ভালর জন্যই বলি—এখানে আর এস না, গুলির দোকানে আর ঢুকো না—বাড়ি যাও, ঘরবাড়ি স্ত্রী-পুত্র দেখ গে, একটা চাকরি-বাকরি কর, ছেলেমেয়ের মুখে দুটো অন্ন দাও, তারপর প্রবৃত্তি হয় এখানে এসো।

কাত্যায়নী শয্যা হইতে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া দশটি টাকা বাহির করিয়া হারাণচন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, এই নিয়ে যাও—

হারাণচন্দ্র বহুক্ষণ অধোবদনে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল, তাহার পর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমার দরকার নেই।

কাত্যায়নী অল্প হাসিল; হাত দিয়া হারাণের মুখখানা তুলিয়া বলিল, যে কিছু জানে না তার কাছে অভিমান করো—এ না নিয়ে গেলে কাল তোমাদের সবাইকে উপুস করতে হবে, তা জান?

কেন?

তোমাদের যে কিছু নেই।

কেমন করে জানলে?

এইমাত্র তুমি যে নিজেই বললে—ছেলের মুখের খাবার কেড়ে খেয়েচ।

ওঃ—

শুধু তাই নয়। তুমি এত কথা না বললেও আমি আগে থেকেই সমস্ত জানি। আমি নিজে তোমাদের বাড়ি গিয়ে সব দেখে এসেছি।

কেন?

প্রথমতঃ মেয়েমানুষের এসব আপনিই দেখতে ইচ্ছে হয়, তার পর সব দেখেশুনে আটঘাট না বেঁধে চললে আমাদের চলে না। তোমরা যত বোকা, মেয়েমানুষ হলেও আমরা তত বোকা নই। তোমাদের স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, আত্মীয় আছে, বন্ধু আছে, একবার ঠকলে আর একবার উঠতে পার, কিন্তু আমাদের কেউ নেই—একবার পড়ে গেলে আর উঠতে পারব না, আমরা না খেতে পেয়ে মরে গেলেও কারো দয়া হবে না। লোকে বলে, 'যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন, আমাদের সে ভরসাও নেই। তাই সমস্ত জিনিস খুব সাবধানে নিজে না দেখেশুনে চললে কি আমাদের চলে? বুঝেচ?

কাত্যায়নীরও বোধ হয় ক্লেশ হইতেছিল; এসব কথা কহিতে কহিতে সে-মুহূর্তের জন্যও হৃদয়ে একটু ব্যথা অনুভব করা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তৎক্ষণাৎই সে সমস্ত ঢাকা দিয়া ফেলিল। হারাণচন্দ্রের মুখখানা একটু নাড়িয়া দিয়া বলিল, যা বললাম সব বুঝেচ? এই টাকাগুলো তোমার স্ত্রীর হাতে দিও—তবুও দুদিন স্বচ্ছন্দে চলবে। নিজের কাছে কিছুতেই রেখো না। শুনচ?

হারাণচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।

অনেক রাত্রি হল, আজ আর কোথাও যেও না। এইখানেই শুয়ে থাক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তীকে গ্রামের অর্ধেক লোক ‘সদাদাদা’ বলিয়া ডাকিত, অর্ধেক লোক ‘সদাপাগলা’ বলিয়া ডাকিত। এই হলুদপুর গ্রামেই তাহার বাটী। তাহার পিতা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ইংরেজি ম্লেচ্ছ ভাষা, ইংরেজি শিখিলে ধর্ম নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি পুত্রকে লিখিতে পড়িতে শিখান নাই। আর প্রয়োজনই বা কি? যে দু-দশ বিঘা জমিন আছে তাহাতে পরের চাকুরি করিতে হইবে না, তবে মিছামিছি জাতি দিয়া কি হইবে? কেহ বলিত, সে সংস্কৃত ভাষা জানে, কেহ বলিত, জানে না; যাহা হউক এ বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু সে যে পাগল তাহাতে আর মতভেদ নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্বীকার করে, তাহার একটু বাতিকের ছিট আছে। জমি দেখে, রামপ্রসাদী গান গাহে, মড়া পোড়ায়, এ বাটী ও বাটী করে, এমনি করিয়া মনের আনন্দে দিন কাটিয়া যায়। দূরসম্পর্কের এক পিসি ভিন্ন সংসারে আপন বলিতে তাহার কেহ নাই; তাই গ্রামসুদ্ধ লোককে সে আপনার করিয়া লইয়াছে। সকলেই তাহার আত্মীয়, সকলের সহিতই তাহার সম্পর্কের ডাক, সকল স্থানেই তাহার অবারিত দ্বার।

পূর্বেই বলিয়াছি, সংসারে তাহার কেহ আপনার লোক নাই। বাল্যকালে সদানন্দর পিতা অনেক টাকা পণ দিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে এক বৎসরের মধ্যেই বধূটির মৃত্যু হয়। সেই অবধি, আজ ছয় বৎসর হইল, সদানন্দ একাকী আছে। টাকা জুটিয়া উঠে নাই বলিয়াই হউক, আর ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই হউক, সে আর বিবাহ করে নাই। তাহাদিগকে অনেক টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইত; কেহ বিবাহের কথা পাড়িলে সে তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিত, অত টাকা পাই কোথায় যে বিবাহ করিব?

আজ অপরাহ্নে আকাশে ভারী মেঘ করিয়াছে। সমস্ত নিশ্চল, নিস্তব্ধ। প্রকৃতি এমনি ভাব ধরিয়া আছে যেন সে ইচ্ছা করিলে এখনই প্রবলধারে জল ঢালিতে পারে এবং ইচ্ছা না করিলে হয়ত এখনও তিন-চারি ঘণ্টা স্থগিত রাখিতে পারে।

পিসি রাসমণি ডাকিয়া বলিলেন, ও ললনা, ঘরে যে একফোঁটা খাবার জল নেই। চট করে ঘাট থেকে এক কলসী জল নিয়ে আয় না, মা।

ললনা কলসী কাঁকালে গঙ্গার ঘাটে আসিল। জল লইয়া দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই মেঘ হইতে বড় বড় ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। ললনা হনহন করিয়া পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। আসিবার পথেই সদানন্দর বাটী; পথের ধারের আটচালাঘরের বারান্দায় বসিয়া সে তখন রামপ্রসাদী সুরে কালীনাম গাহিতেছিল। ললনাকে দেখিয়া সে গান থামাইয়া বলিল, ললনা, ভিজচ কেন?

ললনা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তুমি গান থামালে কেন?

সদানন্দও হাসিল; হাসি গান তাহার মুখে অষ্টপ্রহর লাগিয়াই আছে। সুর করিয়া বলিল, গান থামিয়া গেছে ; তাহার পর স্বাভাবিক স্বরে কহিল, সেকথা যাক, মিছামিছি ভিজো না, এইখানে একটু দাঁড়াও।

ললনা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সদানন্দ তাহার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল, দাঁড়িও না, বাড়ি যাও।

সে কি?

পিসিমা বাড়ি নাই, বেশি জল আসিলে যাইবে কেমন করিয়া?

ললনা ভাবিল, সেকথাও বটে; দুই পদ অগ্রসর হইয়া আবার পিছাইয়া আসিল।

সদানন্দ বলিল, ফিরিলে কেন?

কাল রাত্রে আমার জ্বর হয়েছিল, জলে ভিজলে অসুখ বাড়তে পারে।

তবে যেও না, এইখানে দাঁড়িয়ে থাক।

সদানন্দ তখন আপন মনে গান ধরিল—

কভু তারে পাব না বুঝি, মিছে হাত বাড়ায়ে দাঁড়ায়ে আছি।

কত জ্বালায় জ্বলে মরি, তুই কি জানবি পাষাণী মা!

আমার সোনার তরি ডুববে এবার—

ললনা কলসী নামাইয়া গান শুনিতেছিল; মিষ্ট গলায় মিষ্ট গান তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল। হঠাৎ মাঝপথে থামিয়া যাওয়ায় বলিল, ওকি থামিলে যে?

আর গাইব না।

কেন?

আর মনে নাই।

ললনা মৃদু হাসিয়া বলিল, তবে গাইলে কেন?

আমি অমন গেয়ে থাকি। তাহার পর কিছুক্ষণ আকাশপানে চাহিয়া বলিল, মেঘের উপর পদ্ম ফোটে, তুমি দেখেচ?

ললনা সহাস্যে বলিল, কই না, তুমি দেখেচ?

হ্যাঁ দেখেচি। কবে দেখলে?

প্রায়ই দেখি।যখন আকাশে মেঘ হয় তখনই দেখতে পাই।

সদানন্দর গম্ভীর মুখশ্রী দেখিয়া ললনার হাসি আসিল। মুখে কাপড় দিয়া বলিল, তা কি হয়?

কেন হবে না? পদ্ম ত জলেই ফোটে, মেঘেতেও জলের অভাব নেই, তবে সেখানে ফুটবে না কেন?

মাটি না থাকলে শুধু জলেতে কি পদ্ম ফোটে?

সদানন্দ ললনার মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বলিল, তাই বটে! সেই জন্যই শুকিয়ে যাচ্ছে।

ললনা আর কিছু কহিল না। সকলেই জানিত সদাপাগলা দিনের মধ্যে অমন অনেক অসম্ভব ও অসংলগ্ন কথা কহিয়া থাকে।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া সদানন্দ আবার কহিল, ললনা শারদা আর তোমাদের বাটীতে যায় না?

ললনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। বোধ হয় তখনকার মুখ সদানন্দকে দেখাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল না।

সদানন্দ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, যায় না?

না।

কেন?

তা বলতে পারি না।

সদানন্দ গান ধরিল—

গান থামিল, কিন্তু বৃষ্টি কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। বরং আকাশের মেঘ গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল। ললনা কাঁকে কলসী তুলিয়া লইল। সদানন্দ দেখিয়া বলিল, ওকি, যাও কোথা?

বাড়ি যাই।

এত বৃষ্টিতে যাইলে অসুখ করিবে যে।

কি করব!

ললনা চলিয়া গেলে সদানন্দ আবার গান ধরিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হারাণচন্দ্র যখন স্ত্রীর হস্তে পুরাপুরি দশটি টাকা গুণিয়া দিলেন তখন শুভদার মুখের হাসি ফুটিয়াও ফুটিতে পাইল না,বরং ম্লান হইয়া নতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, এ টাকা তুমি কোথায় পেলে?

সেও সে টাকা হাসিয়া দিতে পারে নাই।কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া বলিল, শুভদা, তোমার কি মনে হয় এ টাকা আমি চুরি করিয়া আনিয়াছি?

শুভদা আরও মলিন হইয়া গেল। তাহার পাপ অন্তঃকরণে একথা হয়ত একবার উদয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কি বলা যায়? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহা কি লওয়া উচিত? চুরি করা ধন খাইবার পূর্বে সে অনাহারে মরিতে পারে, কিন্তু আর সকলে? প্রাণাধিক পুত্রকন্যারা? শুভদা বুঝিল, একথা আলোচনা করিবার এখন সময় নহে, তাই টাকা দশটি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিল।

কতক সুখ-স্বচ্ছন্দে আবার দিন কাটিতে লাগিল। হারাণ মুখুজ্যেকে এখন আর বড় একটা হলুদপুরে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাটী আসিলে রাসমণি যদি জিজ্ঞাসা করে, তুই সমস্তদিন কোথায় থাকিস রে?

হারাণ বলে, আমার কত কাজ, চাকরির চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াই।

শুভদাও মনে করে তাহাই সম্ভব, কেন না আর সে পয়সা চাহিতে আসে না, কাল শোধ করিয়া দিব বলিয়া আর দুই আনা, চারি আনা, ধার করিয়া লইয়া যায় না। সে কোথায় থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিব, কেননা আমি তাহা জানি। সে সমস্তদিন অনাহারে অবিশ্রামে চাকরির উমেদারি করিয়া বেড়ায়। কত লোকের কাছে গিয়া দুঃখের কাহিনী কহে, কত আড়তদারের নিকট এমন কি সামান্য দোকানদারদিগের নিকটও খাতাপত্র লিখিয়া দিবে বলিয়া কর্ম

প্রার্থনা করে, কিন্তু কোথাও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। সে অঞ্চলে অনেকেই তাহাকে চিনিত; সেইজন্য কেহই বিশ্বাস করিয়া রাখিতে চাহে না। সন্ধ্যার সময় হারাণচন্দ্র শুষ্কমুখে বাটী ফিরিয়া আইসে; শুভদা ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করে, আজ কোথায় খেলে?

হারাণচন্দ্র স্ত্রীর কথায় হাসিবার চেষ্টা করে; বলে, আমার খাইবার অভাব কি? কে আমাকে না জানে?

শুভদা আর কথা কহে না, চুপ করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ তাহার কলসীর জল শুকাইয়া আসিতেছে, টাকা ফুরাইয়া আসিতেছে; আর দুই-একদিনেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া শুভদা তাহার স্বামীর নিকটে বলিতে পারে না, কাহাকেও জানাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না, শুধু আপন মনে যাহা আছে তাহা লইয়াই নাড়াচাড়া করে।

আজ তিন দিবস পরে অনেক রাত্রে স্বামীর শ্রান্ত পা-দুটি টিপিতে টিপিতে শুভদা মনে মনে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ তর্কবিতর্ক করিয়া মুখ ফুটিয়া কহিল, আর নেই, সব টাকা ফুরিয়ে গেছে।

হারাণচন্দ্র চক্ষু মুদিয়া সাধারণভাবে বলিলেন, দশ টাকা আর কতদিন থাকে।

আর কোন কথা হইল না। দুজনেই সে রাত্রের মত চুপ করিয়া রহিল। শুভদা ভাবিয়াছিল, কাল কি হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে; কিন্তু পারিল না। বিনা কারণে নিজেই অপরাধী সাজিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিয়াছিল, খরচ করিতে করিতে টাকা কেন ফুরাইয়া যায়, এজন্য বিশেষ তিরস্কৃত হইবে। সত্য সত্য তিরস্কৃত হইলে বোধ হয় সে দোষ ক্ষালন করিতে প্রয়াস পাইত, কিন্তু তৎপরিবর্তে সহানুভূতি পাইয়া আর কথা ফুটিল না।

পরদিন ভোর না হইতেই হারাণচন্দ্র চলিয়া গেলেন। ললনা যেরূপ গৃহকর্ম করে, করিতে লাগিল। রাসমণি নিয়মিত স্নান করিয়া আসিয়া মাটির শিব গড়িয়া

ঘরে বসিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, শুধু শুভদার হাত-পা চলে না, ম্লানমুখে এখানে একবার, ওখানে একবার করিয়া বসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বেলা আটটা বাজে দেখিয়া ললনা কহিল, মা, তুমি আজ ঘাটে গেলে না? বেলা যে অনেক হল।

এই যাই।

ললনা কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, জননী সেইখানে সেইভাবেই বসিয়া আছেন। বিস্মিত হইয়া বলিল, কি হয়েছে মা?

কিছুই না।

তবে অমন করে বসে আছ যে?

আর কি করব? সেকি? নাবে না? ভাত চড়াবে না?

শুভদা তাহার চক্ষু দুটি কন্যার মুখের উপর রাখিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, আজ কিছু নেই।

কি নেই?

কিছুই নেই। ঘরে একমুঠো চাল পর্যন্ত নেই।

ললনার মুখ শুকাইয়া উঠিল—তবে কি হবে মা? ছেলেরা কি খাবে?

শুভদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, ভগবান জানেন।

কিছুক্ষণ পরে বলিল, একবার তোর বিন্দুপিসির কাছে গেলে হয় না?

কেন মা?

যদি কিছু দেয়।

ললনা চলিয়া গেলে শুভদার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন কথা সে আর কখন বলে নাই, এমন করিয়া ভিক্ষা করিতে কন্যাকে আর কখন সে পাঠায় নাই। সে কথাই তাহার মনে হইতেছিল। লজ্জা করিতেছিল, বুঝি একটু অভিমানও হইয়াছিল। কাহার উপরে? জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়ত স্বামীর মুখ মনে করিয়া উপরপানে হাত দেখাইয়া বলিত—তাঁর উপরে !

কপোলে হাত দিয়া অনেকক্ষণ সেইখানে শুভদা বসিয়া রহিল। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে; এমন সময় ছলনাময়ী একটা বেনে পুতুলের সর্বাঙ্গে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে এবং পুঁতির মালায় তাহার হস্তপদহীন ধড়খানা বিভূষিত করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা, ভাত দাও।

শুভদা তাহার মুখপানে চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

ছলনা আবার বলিল, বেলা হয়েচে, ভাত দাও মা।

তথাপি উত্তর নাই।

এ হাতের পুতুল ও হাতে রাখিয়া ছলনা আরো একটু উচ্চকণ্ঠে কহিল, ভাত বুঝি এখনো হয়নি?

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

কেন হয়নি? তুমি বুঝি বেলা পর্যন্ত শুয়েছিলে ! তাহার পর কি মনে করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া চিৎকার করিয়া বলিল, উনুনে আগুন পর্যন্ত এখনো পড়েনি বুঝি?

শুভদা বাহির হইতে ক্ষুব্ধভাবে কহিল, এইবার দেব।

ছলনা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মার মুখখানা দেখিয়া এইবার যেন একটু অপ্রতিভ হইল। কাছে বসিয়া বলিল, মা, এখন পর্যন্ত কিছু হয়নি কেন?

এইবার সব হবে।

মা, তুমি অমন করে আছ কেন?

এই সময়ে ঘরের ভিতর হইতে পীড়িত মাধব ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, ও মা!

শুভদা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছলনাময়ীও দাঁড়াইয়া বলিল, তুমি বস, আমি মাধবের কাছে গিয়ে বসি।

তাই যা, মা।

বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ললনা খিড়কির দ্বার দিয়া ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু বিন্দুবাসিনী সেখানে নাই। পূর্বরাত্রেই সে শ্বশুরবাটী চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে হঠাৎ যাইতে হইয়াছিল, না হইলে শুভদার সহিত নিশ্চয় একবার দেখা করিয়া যাইত।

ম্লানমুখে ললনা ফিরিয়া আসিল। পথে তাহার কিছুতেই পা চলিতে চাহে না। গাঙ্গুলীবাড়ি যাইবার সময় লজ্জায় তখনও পা চলিতেছিল না। কিন্তু শুধুহাতে ফিরিয়া আসিবার সময় আরো লজ্জা করিতে লাগিল। পথের ধারে একটা গাছতলায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কি ভাবিয়া অন্য পথে গঙ্গার ঘাটপানে চলিল।

নিকটে চক্রবর্তীদের বাটী। বাহিরে আটচালার পার্শ্বে সদানন্দ একটা গোবৎসকে বহুবিধ সম্বোধন করিয়া আদর করিতেছিল। ললনা সেইখানে প্রবেশ করিয়া নিকটে দাঁড়াইল।

সদানন্দ মুখ ফিরাইয়া বলিল, ললনা, তুমি যে!

পিসিমা বাড়ি আছেন?

না। এইমাত্র কোথায় গেলেন।

ললনা ইতস্ততঃ করিয়া একপদ পিছাইয়া দাঁড়াইল।

সদানন্দ গোবৎসকে ছাড়িয়া দিয়া ললনার মুখপানে চাহিয়া বলিল, পিসিমার কাছে দরকার আছে কি?

হাঁ।

তিনি ত বাড়ি নেই, আমাকে বললে হয় না?

ললনাও সেই কথা ভাবিতেছিল, কিন্তু সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র লজ্জায় তাহার সমস্ত বদন লাল হইয়া গেল। বাটীতে কিছু খাইবার নাই সেইজন্য আসিয়াছি—ছি ছি !

একথা কি বলা যায়? একদিন না খাইলে কি চলে না? কিন্তু আর সবাই? শুভদাও একদিন ঠিক এই কথাই ভাবিয়াছিল, আজ ললনাও তাহাই ভাবিল — তবু মুখ ফুটে না। যে কখনো এই অবস্থায় পড়িয়াছে, সে–ই জানে ইহা বলা কত কঠিন ! সেই কেবল বুঝিবে ভদ্রলোকের একথা বলিতে গিয়া বুকের মাঝে কত আন্দোলন, কত ঘাত – প্রতিঘাত হইয়া যায়। বলিবার পূর্বে কেমন করিয়া জিহ্বার প্রতি শিরা আপনা-আপনি আড়ষ্ট হইয়া ভিতরে ভিতরেই জড়াইয়া যায়!

ললনা মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না; কিন্তু সদানন্দ যেন বুঝিতে পারিল, তাহার মুখ দিয়া ভিতরের ছায়া বুঝি কতক অনুমান করিয়া লইল, তাই হাসিয়া উঠিয়া ললনার হাত ধরিল। সে পাগল; সকলেই জানিত সদাপাগলার মতি স্থির নাই। এমন অনেক কাজ সে করিয়া ফেলিত যাহা অন্যে করিতে পারিত না; অন্যে যাহাতে সঙ্কোচ করিত, সে হয়ত তাহাতে সঙ্কোচ করিত না; অন্যকে যাহা মানাইত না, তাহাকে হয়ত সেটা মানাইয়া যাইত। তাই স্বচ্ছন্দে আসিয়া সে ললনার হাত ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, আজ বুঝি ললনার তার সদাদাদাকে লজ্জা হইতেছে?

সদাপাগলাকে বুঝি লজ্জা করিতে হয়? হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, কি, কথা বলিবে না?

সদানন্দের গলার স্বর, কথার ভাব—একরকমের। হাসিতে হাসিতেও সে অনেক সময় এমন কথা বলিত, যাহা শুনিলে চোখের জল আপনি উছলিয়া উঠে। তথাপি ললনা কথা কহে না। এবার সদানন্দ মুখ তুলিয়া নিতান্ত গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বলিল, কি রে ললনা? কিছু হইয়াছে কি?

ললনা মুখ নিচু করিয়া চক্ষু মুছিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, আমাকে একটা টাকা দাও।

সদানন্দ পূর্বের মত, বরং আরো একটু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, এই কথা! এটা বুঝি আর সদাদাদাকে বলা যায় না? কিন্তু টাকা কি হবে?

তখনও লজ্জা! ললনা ইতস্ততঃ করিয়া লজ্জায় আরো একটু রক্তবর্ণ হইয়া বলিল, বাবা বাড়ি নেই।

সদানন্দ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একটার পরিবর্তে পাঁচটা টাকা আনিয়া ললনার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, মানুষের মত মানুষ হলে তাহাকে লজ্জা করিতে হয়। পাগলকে আবার লজ্জা কি? তাহার পর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, যখন কিছু প্রয়োজন হইবে তখন ক্ষ্যাপা পাগলাটাকে আগে আসিয়া বলিও। কেমন বলিবে ত?

ললনা দেখিল তাহার হস্তে অনেকগুলি টাকা গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই বলিল, এত টাকা কি হইবে?

রাখিয়া দিলে পচিয়া যাইবে না।

তা হোক, এত টাকায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই।

টাকা ফিরাইয়া দিতে আসিতেছে দেখিয়া সদানন্দ আবার আসিয়া তাহার হাত ধরিল। কাতরভাবে বলিল, ছি, ছেলেমানুষি করো না। টাকার প্রয়োজন না থাকে অন্যদিন ফিরাইয়া দিও। আর একথা কাহাকেও বলিও না; তবে নিতান্ত যদি বলিতে হয়, বলিও যে সদাপাগলা টাকায় চারি পয়সা হিসাবে সুদে টাকা ধার দিয়েছে।

দিনমান এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। সকলে আহার করিল, কিন্তু শুভদা সেদিন জলস্পর্শও করিল না। রাসমণি অনেক গালাগালি করিলেন, ললনা অনেক পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু কিছুই সেদিন তাহার মুখে উঠিল না।

সন্ধ্যার পর হারাণচন্দ্র রুক্ষ মাথায়, একহাঁটু ধূলা লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বস্ত্রের কোঁচার একপার্শ্বে সের দুই আন্দাজ চাউল, অপরপার্শ্বে একটু লবণ, দুটো আলু, দুটো পটল, আরো এমনি কি কি বাঁধা ছিল। একটা পাত্র আনিয়া সেগুলি খুলিয়া রাখিবার সময় শুভদা কাঁদিয়া ফেলিল। চাউল একরকমের নহে; তাহাতে সরু, মোটা, আতপ, সিদ্ধ সমস্তই মিশ্রিত ছিল। শুভদা

বেশ বুঝিতে পারিল, তাহার স্বামী তাহাদিগের জন্য এইগুলি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার একটু পূর্বে মাধব বলিল, বড়দিদি, আমি বোধ হয় আর ভাল হতে পারব না। ললনা সস্নেহে ভ্রাতার মস্তকে হাত রাখিয়া আদর করিয়া কহিল, কেন ভাই ভাল হবে না? আর দুদিনেই তুমি সেরে উঠবে।

কত দুদিন কেটে গেল, কই সেরে ত উঠলাম না।

এইবার সারবে।

আচ্ছা, যদি ভাল না হই?

নিশ্চয় হবে।

যদি না হই?

ললনা তাহার দুর্বল ক্ষীণ হাত দুইটি আপনার হাতে লইয়া অল্প গম্ভীর হইয়া বলিল, ছিঃ, ওকথা মুখে আনতে নেই।

মাধব আর কথা কহিল না। চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ললনা কহিল, কিছু খাবি কি?

মাধব মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

কিছুক্ষণ পরেই ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইল। ললনা একটা ছোট কাঁচের গ্লাসে একটু পাঁচন ঢালিয়া মাধবের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, খাও।

মাধব পূর্বের মত শিরশ্চালন করিল। ঔষধ সে কিছুতেই খাইবে না। সে এরূপ প্রায়ই করিত, তিক্ত ঔষধ বলিয়া কিছুতেই খাইতে চাহিত না, কিন্তু একটু জোর করিলেই খাইয়া ফেলিত।

ললনা বলিল, ছিঃ, দুষ্টামি করে না—খাও।

মাধব হস্তে গ্লাস লইয়া সমস্ত ঔষধটা নীচে ফেলিয়া দিল।

মাধব আর কখনও এরূপ করে নাই। ললনা বিস্মিত হইল, ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, ও কি মাধু!

আমি ওষুধ আর খাব না।

কেন?

মিছামিছি খাব কেন? যদি ভালই হব না, তবে ওষুধ খেয়ে কি হবে?

কে বলেচে ভাল হবে না?

মাধব চুপ করিয়া রহিল।

ললনা নিকটে আসিয়া উপবেশন করিল। তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিল, মাধু, আমার কথা শুনবে না?

বালক-সুলভ অভিমানে তাহার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল।

আমার কথা কেউ শোনে না, আমিও কারো কথা শুনব না।

কে তোমার কথা শোনে না?

কে শোনে? আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে মা রাগ করেন, বাবা রাগ করেন, পিসিমা কথা কন না, তুমিও রাগ কর, তবে আমি কেন কথা শুনব?

মাধবের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ললনা সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, আমি শুনব।

তবে বল, আমি ভাল না হলে কি রোজ এমনি করেই শুয়ে থাকব?

তা কেন?

তবে কি?

ললনার ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল। কোন কথা কহিতে পারিল না।

মাধব তাহার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, বড়দিদি, আমাদের ছোটভাই যাদুর অসুখ হয়েছিল, কিন্তু সে ভাল হল না। তার পর মরে গেল। বাবা কাঁদলেন, মা কাঁদলেন, পিসীমা কাঁদলেন, তুমি কাঁদলে—সবাই কাঁদলে — মা আজও কাঁদেন, কিন্তু সে আর এল না, আমিও যদি তার মত মরে যাই?

ললনা দুই হস্তে নিজের মুখ আবৃত করিল। অন্যসময় হইলে সে তিরস্কার করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিত, কিন্তু এখন পারিল না। মাধবও কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর পুনর্বার কহিল, বল না বড়দিদি, মরে গেলে কি হবে?

ললনা মুখ আবৃত করিয়াই কহিল, কিছু না—শুধু আমরা কাঁদব। বুঝি সে তখনই কাঁদিতেছিল।

মাধব বুঝিতে পারিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু সে আজ আর ছাড়িবে না; অনেকদিন হইতে যে কথার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছিল তাহা আজ সমস্ত জানিয়া লইবে। তাই পুনর্বার বলিল, দিদি, মরে গিয়ে কোথায় যেতে হয়?

ললনা উপর পানে চাহিয়া বলিল,—ঐখানে—আকাশের উপরে।

আকাশের উপরে? বালক বড় বিস্মিত হইল—কিন্তু সেখানে কার কাছে থাকব?

ললনা অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, আমার কাছে।

মাধব অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। হাসিয়া বলিল, তবে ভাল। আচ্ছা, আমাদের সেখানে বাড়ি আছে?

আছে।

তবে আরো ভাল। আমরা দুজনে সেখানে বেশ থাকব, না?

হাঁ। ললনা মনে মনে প্রার্থনা করিল যেন তাহাই হয়।

মাধব হাত দিয়া তাহার মুখ আপনার দিকে ফিরাইয়া বলিল, বড়দিদি, সেখানে যা ইচ্ছে তাই খেতে পাওয়া যায়—না?

যায়।

অনেক ডালিম আছে?

আছে।

বালক একগাল হাসিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিল, যেন এত আনন্দ সে একপার্শ্বে একভাবে থাকিয়া সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারিবে না। কিন্তু তখনই আবার ফিরিয়া বলিল, দিদি, কবে যাওয়া হবে?

মাধু!

কি দিদি?

মাকে ছেড়ে তুই কেমন করে যাবি?

কেন, মা – ও ত যাবে!

যদি না যায়?

আমি ডেকে নিয়ে যাব।

তাতেও যদি না যায়?

এইবার মাধব বড় বিষণ্ণ হইল। দিদি, মা কি কখন যাবে না?

যাবে, কিন্তু অনেকদিন পরে।

তা হোক—আমরা আগে যাব; তার পর না হয় মা যাবে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল, মাকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না?

না। একথা মাকে বললে তিনিও যাবেন না—আমাকেও যেতে দেবেন না।

মাধব ভয়ে ভয়ে বলিল, তবে বলব না। তুমি আমাকে ওষুধ দিয়ে খাও গে যাও। আমি শুয়ে থাকি।

ঔষধ খাইয়া, বাতাসা খাইয়া, জল খাইয়া, মাধবচন্দ্র মনের সুখে আকাশের কথা ভাবিতে লাগিল। সেখানে কত কি করিবে, কত ঘুরিয়া বেড়াইবে, কত ডালিম খাইবে, দুই-চারিটা জননীর নিকটে নীচে ফেলিয়া দিবে, ভাল ভাল পাকা ডালিম নিজে খাইয়া খোসাগুলো ছলনাদিদির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিবে, একটি দানাও তাহাতে রাখিবে না, ছলনাদিদি খুব চাহিবে, অনেক চাহিবে—তবে দুটো-

একটা ফেলিয়া দিবে,—আরো কত কি শত–সহস্র কর্মের তালিকা মনে মনে প্রস্তুত করিতে করিতে মাধবচন্দ্র সে রাত্রের মত ঘুমাইয়া পড়িল।

আর ললনা? সেও সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইল। পিসিমা রাসমণি, জননী শুভদা, ছলনা, হারাণচন্দ্র সকলেই ডাকাডাকি করিল, কিন্তু কিছুতেই সে উপরের দ্বার খুলিল না।

বড় মাথা ধরিয়াছে—আমাকে ডাকিও না—আমি কিছুতেই উঠিতে পারিব না।

পরদিন হইতে মাধবচন্দ্র একটু অন্যরকম হইয়াছে। সে একে শান্ত, তাহার উপর আরো শান্ত হইয়াছে। ঔষধ খাইতে আর আদৌ আপত্তি করে না; এটা খাব না, ওটা দাও, ও খাব না, তা দাও, এরূপ একবারো বাহানা করে না। আজকাল সর্বদাই প্রফুল্ল। মা যদি কখন জিজ্ঞাসা করেন, মাধু, কিছু খাবি কি? সে বলে, দাও।

কি দেব?

যা হয় দাও।

বড়দিদি কাছে বসিয়া থাকিলে ত আর কথাই নাই। দুজনে চুপি চুপি অনেক কথা কহে, বিস্তর পরামর্শ করে; কিন্তু কেহ আসিয়া পড়িলে চুপ করিয়া যায়।

এখন হইতে হারাণের সংসারে আর তেমন ক্লেশ নাই। যখন বড় কিছু হয় তখনই ললনা দুটো – একটা টাকা বাহির করিয়া দেয়। শুভদা জানে, কোথা হইতে টাকা আসিতেছে, রাসমণি ভাবে হারাণ কোথা হইতে লইয়া আসে, হারাণ ভাবে, মন্দ কি! যখন কোথা হইতে আসিতেছে, তখন কোথা হইতেই আসুক। আমিই বা কোথা হইতে আনিব? তবে একটা কথা তাঁহার আজকাল প্রায়ই মনে হইতেছে, সে কথাটা আফিমের মৌতাত সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে ভয় হয়, অভ্যাসটা বুঝি একেবারেই ছাড়িয়া যাইতেছে। আর ছাড়িলেই বা উপায় কি? বাহাল

রাখিবার মত আফিম বা কোথা হইতে যোগাইব? যেমন করিয়াই হউক আর যাহা করিয়াই হউক পেট ভরিয়া যখন চারিটা খাইতে পাইতেছি, তখন ওজন্য আর মন খারাপ করিব না; সময় ভাল হইলে আবার সবই হইবে, এখন যেমন আছি তেমনিই থাকি।

দিনকতক পরে সদানন্দর পিসিমাতা একদিন তাহাকে ধরিয়া বসিলেন, বাবা, আমাকে একবার কাশী করিয়া লইয়া আইস; কবে মরিব কিছুই জানা নাই, অন্ততঃ এজন্মে একবার কাশী বিশ্বেশ্বর দেখিয়া লই।

সদানন্দ কোন কিছুতেই আপত্তি করে না, ইহাতেও করিল না। দুই-একদিন পরে কাশী যাইবে স্থির করিল। যাইবার দিন সন্ধ্যাবেলা 'ললনা', ললনা' ডাকিতে ডাকিতে সে একেবারে উপরে আসিয়া উঠিল। ললনা তখন উপরেই ছিল, সদানন্দকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সদানন্দ কোঁচার কাপড়ে করিয়া গোটা-পঞ্চাশ টাকা বাঁধিয়া আনিয়াছিল, সেইগুলি খুলিয়া একটা বালিশের তলায় চাপা দিয়া রাখিয়া বলিল, আমরা আজ কাশী যাইব। কবে ফিরিব বলিতে পারি না। যদি প্রয়োজন হয় এগুলি খরচ করিও।

ললনা বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল—এত টাকা?

সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দও হাসিয়া উঠিল—কত টাকা? পঞ্চাশ টাকা বেশি টাকা নহে! দেখিতে অনেকগুলি বটে, কিন্তু খরচের সময় খরচ করিতে অনেক নহে।

কিন্তু এত—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই সদানন্দ কি একরূপ হস্তভঙ্গি করিয়া একেবারে নীচে আসিয়া রন্ধনশালায় শুভদার নিকট আসিয়া বসিল।

খুড়িমা, আজ আমরা কাশী যাব।

শুভদা সে কথা শুনিয়াছিলেন। বলিলেন, কবে আসবে?

তা কেমন করে বলব? তবে পিসিমার কাশী দেখা হলেই ফিরে আসব বোধ হয়। শুভদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই এস বাবা। আশীর্বাদ করি নিরাপদে থেক।

সদানন্দ উচ্চ হাসিয়া প্রস্থান করিল। পরদিন ললনা অর্ধেকগুলি টাকা নিজের নিকট রাখিয়া অপর অর্ধেক মাতৃসকাশে ধরিয়া দিয়া বলিল, মা, যাবার সময় সদাদাদা এই টাকাগুলি দিয়ে গেছেন।

শুভদা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেগুলি গুণিতে লাগিলেন। গণনা শেষ করিয়া কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন, সদানন্দ আর-জন্মে বোধ হয় আমাদের কেউ ছিল।

ললনা মাথা নাড়িয়া বলিল, বোধ হয়।

এত টাকা কি মানুষে দিতে পারে?

ললনা উত্তর দিল না।

ললনা, সদানন্দ কি পাগল?

কেন?

তবে এমন করে কেন?

দুঃখীর দুঃখে দুঃখী হওয়া কি পাগলের কাজ?

তবে লোকে পাগল বলে কেন?

ললনা সহাস্যে বলিল, লোকে অমন বলে থাকে।

হারাণ মুখুজ্যের সংসারে আজকাল কষ্ট নাই বলিলেই হয়। খাওয়া-পরা বেশ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু পাড়ার পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিতে লাগিল।

কেহ বলিল, হারাণে বেটা নন্দীদের ঢের টাকা মারিয়াছে; কেহ বলিল, বেটা আজকাল একটা বড়লোক। কেহ বলিল, কিছুই নাই—বাড়িতে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না। এমনি অনেক কথা হইত। যাহারা পর তাহারা একটু কম কৌতূহলী

হইয়া রহিল, যাহারা একটু আত্মীয় তাহারা অধিক কৌতূহলী হইয়া মুখোপাধ্যায়-পরিবার সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ছিদ্র খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিন দুপুরবেলা কৃষ্ণঠাকুরানী সহসা আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, বলি বৌয়ের কি হচ্ছে? খাওয়া-দাওয়া চুকল কি?

শুভদা বলিল, হাঁ, এইমাত্র।

তখন কৃষ্ণঠাকুরানী পানের সহিত তামাকপত্র চর্বণ করিতে করিতে এবং পিক্ ফেলিতে ফেলিতে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করতঃ বলিলেন, বৌ, হারাণ আজকাল করছে কি?

কি আর করবেন—চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছেন।

সংসার চলচে কেমন করে?

শুভদা উত্তর করিল না।

কৃষ্ণঠাকুরানী আবার বলিলেন, লোকে বলে হারাণ মুখুজ্যে নন্দীদের ঢের টাকা মেরেচে; সে আজকাল বড়লোক—তার খাবার ভাবনা কি? কিন্তু আমি ত সব কথা জানি, তাই বলি, সংসার এখন চলে কেমন করে?

শুভদা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, অমনি একরকম করে।

হারামজাদা মাগী বামুনপাড়ার কাতি, সে-ই ত দুর্ঘটনা ঘটালে। ইচ্ছে করে মুখপুড়ীকে পাঁশ পেড়ে কাটি।

শুভদা একথা কানে না তুলিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, তোমার খাওয়া হয়েছে?

হাঁ বোন, হয়েছে। সেই হারামজাদীই ত এই সর্বনাশ ঘটালে। হারাণ মুখ্যু কি না, তাই তার ফাঁদে পা দিলে। তিন হাজার টাকা চুরি করলি, না হয় দু শ' এক শ' মাগীর হাতেই এনে দিতিস! তবু ত কিছু থাকত?

শুভদা বলিল, ঠাকুরঝি, আজ কি রাঁধলে?

কি আর রাঁধব বোন? আজ বেলা হয়ে গিয়েছিল, তাই ভাতে-ভাত ছাড়া আর কিছুই করিনি। তা মাগীর কি ছাই একটু পরকালের ভাবনাও আছে? মিন্

সে দুটো টাকার জন্যে যখন হাতে–পায়ে ধরলে, তখন কিনা ঘর থেকে বের করে দিলে! কিন্তু ভগবান কি নেই? বামুনের যেমন সর্বনাশ করেছে, তোর মতন সতীলক্ষ্মীর যখন চোখের জল ফেলিয়েচে, তখন শাস্তি কি হবে না? তুই দেখিস, আমি বললাম—

শুভদা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ঠাকুরঝি, বিন্দু অমন হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি চলে গেল কেন?

ওর শ্বশুরের নাকি রাতারাতি কলেরা হয়েছিল। তা তুই এখন সংসারের কিরকম বন্দোবস্ত করবি?

আমি আর কি করব? ঈশ্বর যা করবেন তাই হবে।

কৃষ্ণঠাকুরানী একটু দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, তা ত হবেই। কিন্তু ভাবনার উপর ভাবনা হচ্চে এই তোর ছোট মেয়েটা। ক্রমে সে বড় হয়ে উঠল — এখন তার বিয়ে না দিলে ভালও দেখাবে না বটে, আর লোকেও পাঁচকথা বলবে। তার কি কিছু উপায় হচ্চে?

শুভদা যখন ম্লানমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল, তখন ললনা সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছলনার কথা সে কতক শুনিতে পাইয়াছিল, এবং কতক অনুমান করিয়া লইয়া বেশ বুঝিল যে, সুসময়ই হউক, আর অসময়ই হউক, বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ের বিবাহ না দিলে চলিবে না; সম্ভবতঃ জাতি যাইবে।

নবম পরিচ্ছেদ

শুক্লা একাদশী রজনীর প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ভাগীরথীতীরের অর্ধবনাবৃত একটা ভগ্ন শিবমন্দিরের চাতালের উপর একজন দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবক যেন কাহার জন্য পথ চাহিয়া বহুক্ষণ হইতে বসিয়া আছেন।

যুবকের নাম শারদাচরণ রায়। এই হলুদপুর গ্রামের একজন বর্ধিষ্ণু লোকের একমাত্র সন্তান। লেখাপড়া কতদূর হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং কর্মদক্ষ তাহা বলিতে পারি। বৃদ্ধ পিতার সমস্ত সাংসারিক কর্ম নিজেই নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। শারদাচরণের জননী জীবিত নাই। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন হারাণ মুখুজ্যেদের বাটীর সহিত ইঁহাদের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। রাসমণি ও শারদার জননী উভয়ের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। এখন তিনিও গত হইয়াছেন, আত্মীয়তা বন্ধুত্বও গত হইয়াছে। বিশেষ শারদাচরণের পিতা হরমোহনবাবু দরিদ্রের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না।

এইখানে একটু ললনার কথা বলিয়া রাখি; কেননা, তাহার সহিত এ আখ্যায়িকায় আমাদিগের অনেক প্রয়োজন আছে। বালিকা-কাল হইতেই শারদার সহিত তাহার ভাব ছিল, তাহার পর তাহার বিবাহ হয়। হারাণবাবুর অবস্থা তখন মন্দ ছিল না, ক্ষুদ্র আয়তনে যতখানি সম্ভব, ঘটা করিয়া বড়মেয়ের বিবাহ দেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যে ললনা দুই বৎসরের মধ্যেই বিধবা হইয়া বাটী ফিরিয়া আইসে। তখনও শারদাচরণের সহিত তাহার ভাব ছিল। সে ভাব কমিল না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ক্রমে দুইজনেরই বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল; ক্রমে দুইজনেই বুঝিতে লাগিল যে, এ প্রণয় পরিণামে বড় সুখের হইবে না। শারদাচরণ না বুঝুক কিন্তু ললনা একথা বেশ বুঝিতে লাগিল। ক্রমশঃ ললনা ভালবাসার

দোকান-পাট একে একে বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। সে আর কাছে আসে না, আর আসিতে বলে না, আর ভালবাসা জানায় না, আর গোপনে তেমন করিয়া পত্র লিখে না—দেখিয়া শুনিয়া শারদাচরণ বড় বিপদে পড়িল। প্রথমে সে অনেক বুঝাইল, অনেক আপত্তি প্রকাশ করিল, অনেক যুক্তি দেখাইল, কিন্তু ললনা কর্ণযুগল বন্ধ করিয়া রহিল। একদিন সে একরূপ স্পষ্টই কহিল যে তাহার এসব আর ভাল লাগে না।

শারদাচরণও সে-দিবস কুপিত হইল, বলিল, যদি ভাল লাগে না তবে এতদিন লাগিল কেন?

এতদিন ছেলেমানুষ ছিলাম, এখন বড় হইয়াছি।

বড় হইলে বুঝি আর ভাল লাগিতে নাই?

না।

কিন্তু বুঝিয়া দেখ—

কথা শেষ না হইতেই ললনা বলিয়া উঠিল, আর বুঝিয়া কাজ নাই। তুমি আমাকে আর কুপরামর্শ দিও না।

শারদাচরণ চটিয়া উঠিয়া বলিল, আমি বুঝি তোমাকে কুপরামর্শ দিই?

দাও না ত কি!

দিই?

দাও

তবে এস আজ সব শেষ করে দিই।

ভালই ত।

তোমার সঙ্গে এজন্মে আমি আর কথা ক'ব না।

ক'য়ো না।

তখন দুইজনে দুজনের গন্তব্যপথে চলিয়া গেল। সমস্ত পথটা শারদাচরণ গর্জিতে গর্জিতে গেল, সমস্ত পথটা ললনা চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিল।

সে আজ চারি বৎসরের কথা। চারি বৎসর পরে শারদাচরণ আবার ললনার পথ চাহিয়া ভগ্ন মন্দিরে বসিয়া রহিল। সে পূর্বের কথা একরকম ভুলিয়া গিয়াছিল, অন্ততঃ যাইতেছিল; কিন্তু ললনাই পুনর্বার অনুরোধ করিয়া তাহাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছে। তাই পূর্বের কথা পুনরায় একটির পর একটি করিয়া তাহার মস্তিষ্কে উদয় হইতে লাগিল। কেহ বলে, বাল্যপ্রেমে অভিসম্পাত আছে; কেহ বলে, বাল্যপ্রেম দৃঢ় হয় না; কেহ কহে, দৃঢ় হয়। যাহাই হউক এবিষয়ে ঠিকঠাক একটা কোনরূপ বন্দোবস্ত করা নাই। সকল রকমই হইতে পারে; কিন্তু যাহাই হউক, ইহার একটি স্মৃতি চিরদিনের জন্য ভিতরে রহিয়া যায়। যেমন করিয়া উপড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হউক না কেন, একটু ক্ষুদ্রতম শিকড় বোধ হয় অনুসন্ধান করিলে অনেক হাত জমির তলে পাওয়া যায়।

শারদাচরণের অনেক কথা মনে হইতে লাগিল। আজ চারি বৎসর পরে সে আবার আসিবে, কাছে বসিবে, কথা কহিবে! শারদার ভিতরটা যেন একটু শিহরিয়া উঠিল, আনন্দে যেন অল্প রোমাঞ্চ হইল। কিন্তু কেন? কেন আসিবে? কেন আমাকে এসময়ে এস্থানে আসিতে অনুরোধ করিল? আর কি সম্বন্ধ আছে?

রাত্রি প্রায় একটা বাজে। একজন স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সেই পথে আসিতে লাগিল। শারদাচরণ ভাবিল, একি ললনা? ললনাই ত বটে, কিন্তু বড় হইয়াছে।

ললনা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। শারদাচরণ সঙ্কোচ ছাড়িয়া বলিল, বসো।

তখন বহুদিন পর দুইজনে মুখোমুখি হইয়া চাঁদের আলোকে ভগ্ন মন্দিরে সেই চাতালের উপর উপবেশন করিল। বহুক্ষণ অবধি কেহ কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর শারদাচরণ সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিল, আমাকে এখানে ডাকাইয়া আনিলে কেন?

ললনা মুখ তুলিয়া বলিল, আমার প্রয়োজন আছে।

কি প্রয়োজন?

বলিতেছি।

পুনরায় বহুক্ষণ নিস্তব্ধে অতিবাহিত হইলে শারদাচরণ বলিল, কই বলিলে না?

বলিতেছি। পূর্বে তুমি আমাকে ভালবাসিতে, এখন আর বাস কি?

প্রশ্নের ভাবে শারদাচরণ বড় বিস্মিত হইল। কহিল, সে কথা কেন?

কাজ আছে।

যদি বলি এখনও ভালবাসি?

ললনা মৃদু হাসিয়া সলজ্জে বলিল, আমাকে বিবাহ করিবে?

শারদাচরণ একটু পিছাইয়া বসিল। বলিল, না।

কেন করিবে না?

তোমাকে বিবাহ করিলে জাতি যাইবে।

গেলেই বা।

খাইব কি?

খাইবার ভাবনা তোমাকে করিতে হইবে না।

কিন্তু পিতার মত হইবে না।

হইবে। তুমি তাঁহার ত একটিমাত্র সন্তান; ইচ্ছা করিলে মত করিয়া লইতে পারিবে।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া শারদাচরণ বলিল, তবুও হয় না।

কেন?

অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ পিতার মত হইলেও, তোমাকে বিবাহ করিলেই জাতি যাইবে। জাতি খুইয়ে হলুদপুর তিষ্ঠান আমাদিগের সুখের হইবে না। আর আমার এমন অর্থও নাই যে, তোমাকে লইয়া বিদেশে গিয়া থাকিতে

পারি। দ্বিতীয়তঃ যাহা ফুরাইয়া গিয়াছে তাহা ফুরাইয়াই যাউক, ইহা আমার ইচ্ছাও বটে, মঙ্গলের কারণও বটে।

ললনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, তবে তাহাই হউক। কিন্তু আমার একটি উপকার করিবে?

বল, সাধ্য থাকে ত করিব।

তোমার সাধ্য আছে, কিন্তু করিবে কিনা বলিতে পারি না।

বল; সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া দেখিব।

আমার ভগিনী ছলনাকে বিবাহ কর।

শারদাচরণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেন, তাহার কি পাত্র জুটিতেছে না?

কৈ জুটিতেছে? আমরা দরিদ্র; দরিদ্রের ঘরে কে সহজে বিবাহ করিবে? শুধু তাই নয়। আমরা কুলীন; অঘরে বিবাহ দিলে হয়ত বর জুটিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে কুলে জলাঞ্জলি দিতে হয়। তোমরা আমাদের পালটি ঘর; তুমি বিবাহ করিলে সবদিকই রক্ষা হয়। বিবাহ করিবে?

আমি পিতার সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন। তাঁর মত না লইয়া কোন কথাই বলিতে পারিব না।

তবে মত লইয়া বিবাহ কর।

আমি যতদূর জানি, এ বিবাহে তাঁহার মত হইবে না।

ললনা ম্লানভাবে কহিল, কেন মত হইবে না?

তবে তোমাকে বুঝাইয়া বলি। লুকাইয়া কোন ফল নাই। আমার পিতা কিছু অর্থপিপাসু; তাঁহার ইচ্ছা যে আমার বিবাহ দিয়া কিছু অর্থ লাভ করেন। তোমরা অবশ্য কিছুই দিতে পারিবে না, তখন বিবাহও হইবে না।

ললনা কাতর হইয়া বলিল, আমরা দরিদ্র, কোথায় কি পাইব? আর তোমাদের অর্থের প্রয়োজন কি? যথেষ্ট ত আছে।

শারদাচরণ দুঃখিতভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল, সেকথা আমি বুঝি, কিন্তু তিনি বুঝিবেন না।

তুমি বুঝাইয়া বলিলে নিশ্চয় বুঝিবেন।

আমি একবার মাত্র বলিব; বুঝাইয়া বলিতে পারিব না।

ললনা নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া বলিল, তবে কেমন করিয়া হইবে?

আমি কি করিব?

তোমার বোধ হয় বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই।

না।

ছলনার মত কন্যা তুমি সহজে পাইবে না। সে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, কর্ম্মিষ্ঠা—অধিকন্তু একজন দরিদ্রের যথেষ্ট উপকার করা হইবে, একজন ব্রাহ্মণের জাতি-কুল রক্ষা করা হইবে এবং আমি চিরদিন তোমার কেনা হইয়া থাকিব। বল, এ বিবাহ তুমি করিবে?

পিতা যাহা বলিবেন তাহাই করিব।

আজ তোমাকে সকল কথা বলি। হয়ত এজন্মে আর কখন বলিবার অবসর পাইব না, তাহাই বলি—তোমাকে লজ্জা কখন করি নাই, আজও করিব না। সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া যাই—তোমাকে চিরদিন ভালবাসিয়া আসিয়াছি, এখনো ভালবাসি। একথা পূর্বে একবার বলিয়াছিলাম, আজ বহুদিন পরে আর একবার শেষ বলিলাম। তুমি, আমার একমাত্র অনুরোধ—বোধ হয় এই শেষ অনুরোধ—রাখিলে না। যা হইবার হইল, আর এমন কখন হইবে না। মিথ্যা তোমাকে এত ক্লেশ দিলাম, সেজন্য ক্ষমা করিও।

শারদাচরণ মনে মনে ক্লেশ অনুভব করিল। ললনা চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বলিল, পিতাকে এবিষয়ে অনুরোধ করিব।

ললনা না ফিরিয়াই বলিল, করিও।

কিন্তু আমি পিতার আজ্ঞাধীন।

ললনা চলিতে চলিতে বলিল, তাহা ত শুনিলাম।

যদি কিছু করিতে পারি তোমাকে জানাইব।

ভাল।

ললনা, আমাকে ক্ষমা করিও।

করিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ

আমার নক্সা,—দাও বাবা চার আনা পয়সা। ‘গাড্ডিলে’র হাত হইতে চারি আনা তাম্রখণ্ড গুণিয়া লইয়া হারাণচন্দ্র কোঁচার খুঁটে জড়াইয়া রাখিলেন। যা থাকে কপালে—ধরলাম আট আনা। আট আনা পয়সা হারাণচন্দ্র সম্মুখে শতচ্ছিন্ন চাটায়ের উপর ঠুকিয়া রাখিয়া তাস হাতে লইলেন। সঙ্গীরা সকলেই উৎকণ্ঠিতভাবে স্ব স্ব তাস দেখিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই হাত দুই-তিন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, ফের নক্সা—দাও ত চাঁদ টাকা! ‘গাড্ডিল’ হারাণচন্দ্রকে টাকা দিয়া তাহার সম্মুখে তাস জোড়া নিক্ষেপ করিল। অপরাপর সকলে একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া স্ব স্ব তহবিল হাতড়াইয়া পয়সা বাহির করিতে লাগিল।

আর চাই—আর চাই—আর চাই?

বস্ কর—আর না।

পনরতে চেপে যাও।

পচে যা—পচে যা বাবা—এই আমার নক্সা।

প্রায় নিশাবসানে হারাণচন্দ্র যখন স্থান পরিত্যাগ করিলেন তখন কোঁচার টিপ টাকায় পয়সায় রীতিমত ভারী। সে রাত্রে তাঁহার আর বাটী যাওয়া হইল না। পরদিনও এ দোকান সে দোকান করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। বেলা চারিটার সময় যখন তিনি বাটিতে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার চক্ষু অসম্ভব রক্তবর্ণ; মুখ, নাক, কাপড়, চাদর, সর্বাঙ্গ হইতে গঞ্জিকার দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে।

হারাণচন্দ্র স্নান করিয়া আহার করিতে বসিলে শুভদা সম্মুখে উপবেশন করিয়া বলিল, আজ বড় বেলা হয়েচে।

কি করি বল, কাজের গতিকে বেলা হয়ে যায়। তুমি এখনো কি খাওনি?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

হারাণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওনি?

এইবার খাব।

হারাণচন্দ্র দুঃখিত হইয়া বলিলেন, এসব তোমার বড় অন্যায়। আমার কিছুই ঠিক নেই। যদি সমস্ত দিন না আসি, তাহলে কি সমস্ত দিন উপবাসী থাকবে?

দুই-এক গ্রাস অন্ন মুখে তুলিয়া হারাণচন্দ্র শুভদার পানে চাহিয়া বলিলেন, কাল সকালবেলা তুমি আমার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলে, না?

শুভদা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কই না।

চাওনি? আমি ভেবেছিলাম চেয়েছিলে। পরে একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, কাল না চেয়ে থাক, দুদিন পরে ত চাইতেই হবে—সে একই কথা। আমার ঐ চাদরের খুঁটে গোটা আষ্টেক টাকা বাঁধা আছে, তা থেকে গোটা পাঁচেক তুমি নিও।

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

সে আজ বড় বিস্মিত হইল; বহুদিন হইতে এরূপ কখন হয় নাই। বহুদিন হইল তিনি এরূপ স্বইচ্ছায় শুভদার হাতে টাকা দিতে আসেন নাই। আহারাদি শেষ হইলে শুভদা বলিল, টাকা পেলে কোথায়?

আজ হারাণচন্দ্রের মুখ ফুটিয়া হাসি বাহির হইল। বলিলেন, ওগো, আমাদের টাকার জন্য ভাবতে হয় না। পুরুষমানুষের পেটে যদি বুদ্ধি থাকে ত তার কাছে সমস্ত পৃথিবীটায় টাকা ছড়ান থাকে। বুঝেছ?

শুভদা কি বুঝিল, সে-ই জানে, কিন্তু প্রতিবাদ করিল না।

উপরোক্ত ঘটনার পরে প্রায় দুইমাস কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

আজ সন্ধ্যার সময় শুভদা ললনার কাছে বসিয়া নিতান্ত মলিন হইয়া বলিল, ললনা, মা, আজ কি কিছু নেই?

কিছুই নেই মা।

কতদিন ওকথা তুই বলেচিস, কিন্তু তার পরেই দুস আনা চার আনা বের করে দিয়েচিস; দ্যাখ মা, যদি কিছু থাকে, নাহলে আজ রাতে জলবিন্দুও কারো মুখে যাবে না।

জননীর কাতর মুখ ও অশ্রুজড়িত গদগদ স্বর শুনিয়া ললনা কাঁদিয়া ফেলিল—কিছুই নেই মা। তোমার পা ছুঁয়ে বলচি, কিছু নেই।

তখন দুইজনেই কাঁদিতে লাগিল। কন্যাকে অনেকটা অবিশ্বাসী করার মত হইয়াছে বলিয়া শুভদা কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু ললনার অশ্রু অন্য কারণে বহিতে লাগিল। সে 'কিছু নাই' বলিয়াও ইহার পূর্বে দিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আজ বাস্তবিকই কিছু দিতে পারিল না। সদানন্দ-প্রদত্ত পঞ্চাশৎ মুদ্রার শেষ বিন্দুটি আজ প্রাতঃকালে নিঃশেষে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সকলে কি খাইবে, কেমন করিয়া রাত্রি কাটিবে, না খাইতে দিতে পারিয়া জননীর মন কেমন হইবে, প্রাতঃকালে আবার কাহার নিকট ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে, এই সব ভাবিয়া তাহার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। বিন্দু ছিল, সে এখন নাই; সদানন্দ ছিল, সেও এখানে নাই। শুধু কি তাই? আজ দুইদিন হইতে হারাণচন্দ্রের দেখা নাই। সম্ভবতঃ গুলির দোকানে, নাহয় জুয়ার আড্ডায়।

এখানে একটু হারাণচন্দ্রের কথা বলি, তিনি গাঁজা টিপিতেন, গুলি খাইতেন, ছয় পয়সা চারি পয়সা কর্জ করিতেন, দুই আনা চারি আনা শুভদার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়া আদায় করিতেন, নিতান্ত দায়ে পড়িলে ফোঁটা কাটিয়া গাময় ছাইভস্ম মাখিয়া ব্রাহ্মণ সন্তানের শেষ বৃত্তি—ভিক্ষা ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন, কিন্তু জুয়ার মর্ম বিশেষ অবগত ছিলেন না। এখন এইটি হইয়াছে। জুয়াখেলার প্রথম অংশে যেরূপ হয়, অর্থাৎ দুই-চারি পয়সা পাওয়া যায়, দুই-চারি টাকা লাভ হয়—তাঁহারও তাহাই হইয়াছিল। প্রথমে কিছু কিছু পাইয়াছিলেন, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, অদৃষ্টও তেমনি গুটাইয়া আসিতে লাগিল। শুভদাকে সেই পাঁচ টাকা দেওয়াই তাঁহার শেষ দেওয়া হইল। তাহার পর যে একেবারে

কিছুই পান নাই তাহা নহে। কখন কিছু কিছু পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন আয় অপেক্ষা ব্যয় ভাগটাই অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্বে তিনি হলুদপুরে তিষ্ঠিতে পারিতেন না। এখন আবার বামুনপাড়ায় তিষ্ঠানও বিপদজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পথিমধ্যে যে-কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় সে-ই কিছু-না-কিছুর জন্য দাবী করিয়া বসে। দুই পয়সা চারি পয়সা, দুই আনা চারি আনা, এমন প্রত্যেক পরিচিত লোকের নিকটই তাঁহার 'কাল দিব' বলিয়া কর্জ করা আছে; প্রতি দোকানদারের তাঁহার নিকট চারি আনা, আট আনা পাওনা আছে। এই সকল কারণে বামুনপাড়ায় তাঁহাকে সচরাচর আর দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে সন্ধ্যার সময় গুলির দোকানটা অনুসন্ধান করিলে একপার্শ্বে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। একটু অধিক রাত্রি হইলে জুয়ার আড্ডাঘরের ঝাঁপ খুলিয়া প্রবেশ করিতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল অধিক রাত্রিই তাঁহার এইখানে অতিবাহিত হয়। পয়সা নাই বলিয়া নিজে খেলিতে পারেন না, কিন্তু পরের খেলায় বাজি মারিয়া মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটি পয়সা লাভ করেন। খেলিতে বসিয়া কেহ উঠিতে চাহে না হারাণচন্দ্র সে-সময়ে তামাক সাজিয়া সরবরাহ করেন, বিজেতার পক্ষ টানিয়া দুটো কথা কহিয়া, দুটো রসিকতা করিয়া, হাতে পৈতা জড়াইয়া দু'বার দুর্গানাম জপ করিয়া জয়ী পক্ষের মন রাখিয়া, মৌতাতের জোগাড়টা করিয়া লন। যে দিবস কিছু অধিক আদায় হয় সেদিন নিজেই দু'হাত খেলিতে বসেন। হয় কিছু পান, নাহয় লাভের অংশ পিপীলিকায় ভক্ষণ করিয়া ফেলে।

দুই-চারি আনা হাতে হইলে সেদিন আর তাহাকে পায় কে? গুলির দোকানে আসিয়া সাবেকি চালে মুরুব্বির আসন গ্রহণ করেন; অনেককে রাজা-উজির প্রভৃতি উচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়া শুভদার মুখখানা মনে করিতে করিতে বাটী আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে অন্ন আছেই। শুভদার জমিদারি কখন ফুরাইবে না; তাঁহার মূর্তিমতী অন্নপূর্ণা শুভদা কখনও রিক্তহস্ত হইবে না। কাহারও

না থাকুক, তাঁহার একমুঠা অন্ন আছেই। কিন্তু বাটী আসিবার সময় তাঁহার একটু মুশকিল হয়; যেন একটু লজ্জা লজ্জা বোধ হয়, বাটীর নিকটবর্তী হইয়া পা যেন আর তেমন করিয়া চলিতে চাহে না। অবশেষে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া আপনাকে আরও একটু বিব্রত বোধ করিতে হয়। শুভদা যেরূপভাবে পা ধুইবার জল লইয়া আইসে, যেরূপভাবে পা মুছাইয়া দিতে আইসে, যেরূপ শুষ্কমুখে ভাতের থালাটি সম্মুখে ধরিয়া দিয়া মৌন হইয়া নিতান্ত অবসন্নভাবে বসিয়া থাকে, তাহাতে হারাণচন্দ্রের মনটাও কেমন কেমন করিতে থাকে, ভাতের গ্রাসগুলো তেমন স্বচ্ছন্দে উদরের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে না। বেলা পাঁচটাই হউক আর রাত্রি তিনটাই হউক—হারাণচন্দ্র দেখিতে পায় শুভদা একইভাবে না খাইয়া না বিশ্রাম করিয়া তাহার ভাতের থালাটি সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছে। একবার বলে না কেন এত বেলা হইল; একবার জিজ্ঞাসা করে না এত রাত্রি করিলে কেন? তাহার বিরস মৌন মুখখানাই তাহাকে অধিক বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে; সে বুঝিতে পারে, সে স্বামী হইলেও এত শ্রদ্ধা এত ভক্তির উপযুক্ত নহে, তা এত যত্ন এত আদর সে নির্বিবাদে ভোগ করিয়া উঠিতে পারে না। সে দেখিতে পায়, একজন ক্রমাগত অপরাধ করিয়া আসিতেছে, আর একজন ক্রমাগত ক্ষমা করিয়া যাইতেছে, তাই গুলিখোর গাঁজাখোর হইলেও তাহার চক্ষুলজ্জা করে। শুভদা একবার তিরস্কার করে না, একবার রাগ করে না, একবার ভাবভঙ্গিতেও প্রকাশ করে না যে তুমি অমন করিও না, অমন করিলে আমি আর পারিয়া উঠিতেছি না। হারাণচন্দ্রের বোধ হয়, যেন তাহার নিজের বিচার তাহাকে নিত্য নিত্য নিজেই করিতে হইতেছে। নিত্য নিত্য এমন করিয়া অবিচার করিতে যেন মাঝে মাঝে সঙ্কোচ বোধ হয়। যাহা হউক, এমনি করিয়াই দিন কাটিয়া আসিতেছিল।

অদ্য অনেকরাত্রে হারাণচন্দ্র বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আজ তাঁহার একটু অন্যরূপ ঠেকিল। আজ শুভদা পদপ্রক্ষালনের জল লইয়া আসিল না, নির্দিষ্ট স্থানে অন্নব্যঞ্জন রক্ষা করিয়া কেহ

বসিয়া নাই। এককোণে একটা প্রদীপ অতি ম্লানভাবে টিপটিপ করিতেছে, দীপালোক উজ্জ্বল করিতে গিয়া হারাণচন্দ্র দেখিলেন তাহাতে তৈল পর্যন্ত নাই। তাঁহার ভয় হইল; আজ দুইদিন তিনি বাটী আইসেন নাই, বুঝি-বা ইহার মধ্যে কিছু হইয়া গিয়াছে। শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া হারাণচন্দ্র নিজের মনে কিসব ভাবিতে লাগিলেন।

ভোর হইয়া আসিতেছে তথাপি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। হারাণচন্দ্র কি ভাবিয়া চোরের ন্যায় শতচ্ছিন্ন পাদুকাটি হাতে লইয়া নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন।

অলক্ষিতে প্রস্থান করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহা হইল না। চাতালের উপর ছলনাময়ী বসিয়া ছিল। অত ভোরে সে কখন গাত্রোত্থান করে না, কিন্তু আজ কি জানি কেন উঠিয়া বাহিরে বসিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, বাবা, তুমি কখন এলে?

হারাণচন্দ্র নিতান্ত অপ্রতিভভাবে বলিলেন, কাল রাতে।

আচ্ছা বাবা, তোমার কি আক্কেল বল ত? কাল মা, পিসিমা, বড়দিদি—কেউ একবিন্দু জল পর্যন্ত খেতে পায়নি, আর তুমি চুপি চুপি জুতো হাতে করে পালিয়ে যাচ্চ? আজ আমরা কি খাব বল ত?

হারাণচন্দ্রের বোধ হইল ছলনাময়ী যেন তাহার মাথাটা কাটিয়া লইয়াছে। হাতের জুতা আপনা-আপনি খসিয়া নীচে পড়িয়া গেল; থতমত খাইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, সত্যি তাই কি?

ছলনা আরও চিৎকার করিয়া ডাকিল, ও পিসিমা, শুনচ বাবার কথা? আমি যেন মিথ্যে কথা বলচি? কাল সমস্ত রাত মা আর বড়দিদি কেঁদেচে—তুমি তা কেমন করে জানবে বল? শুধু খেতে আসা বৈ ত আমাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই!

হারাণচন্দ্র আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, জুতা জোড়াটি হাতে তুলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

ছলনা আর একবার চিৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, বাবা পালিয়ে গেল।

ছলনা ছেলেমানুষ, বুদ্ধি কম, তাহার উপর বিষম দুর্মুখ। কাহাকে কি বলিতে হয়, কখন কি বলিতে হয় সে কখনও শিখে নাই। ললনা এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিতেছিল। পিতা চলিয়া গেলে সে ধীরে ধীরে ছলনার সম্মুখে আসিয়া বলিল, ছলনা, তোমার একটুও কি বুদ্ধি নেই?

কেন?

কাকে কি বলতে হয় এখনো কি শেখনি? বাবাকে অমন করে কি বাক্যযন্ত্রণা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে হয়?

ছলনা কুপিত হইয়া কহিল, আমি তাড়িয়ে দিলাম, না আপনি পালিয়ে গেল!

ছিঃ! বাপকে কি ওকথা বলতে আছে?

কেন বলতে নেই? বাপের মত বাপ হলে তাকে কিছু বলতে নেই, কিন্তু অমনধারা বাপকে সব বলতে আছে। কার বাপ অমন করে দৌড়ে পালিয়ে যায়? কার বাপ অমন করে গাঁজা-গুলি খেয়ে বাইরে পড়ে থাকে? আমি খুব বলব—আরো বলব।

ললনা বিরক্ত হইয়া বলিল, এখান থেকে তুই চলে যা।

আমি কেন চলে যাব, তুই চলে যা। তুই আমার উপর গিন্নিপনা করতে আসিস নে।

হার মানিয়া ললনা মৌনমুখে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেইদিন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, শুভদা রাসমণির কাছে একটা কাংস্যপাত্র রাখিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, বেলা অনেক হল, আজ তিনি বোধ হয় আর আসবেন না। এই ঘটিটা বাঁধা দিয়ে দেখ না যদি কিছু পাওয়া যায়।

রাসমণি শুভদার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বড় লজ্জা করে বৌ।

ললনা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে ঘটিটা তুলিয়া লইয়া বলিল, মা, আমি একবার দেখে আসি।

শুভদা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, কোথায়?

ললনা মৃদু হাসিয়া একবার পিসিমাতার মুখপানে চাহিয়া বলিল, এই ঘোষেদের দোকানে।

তুই যাবি মা !

কেন, তাতে আর লজ্জা কি? আমি এখানকার মেয়ে; ছেলেবেলা থেকে আমাকে সবাই দেখচে, আমার আর লজ্জা কি? সুসময় অসময় কার ঘরে নেই মা?

ললনা চলিয়া যায় দেখিয়া রাসমণি তাহার হস্ত হইতে ঘটিটা টানিয়া লইয়া বলিলেন, তবে আমিই যাই।

সেদিন বেলা তিনটার পর সকলের আহার হইল। সকলে তৃপ্ত হইলে শুভদা ললনাকে একপার্শ্বে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, ললনা, লুকিয়ে দুটো সজনে শাক ছিঁড়ে আন না মা!

ললনা বিস্মিত হইয়া বলিল, এত বেলায় কি হবে বল?

আমার দরকার আছে।

কি দরকার মা?

শুভদা অল্প হাসিয়া বলিল, তোর শুনে কি হবে?

কথার ভাবে ললনা যেন কতক বুঝিতে পারিল, বলিল, হাঁড়িতে বুঝি ভাত নেই?

ভাত কেন থাকবে না?

তবে কেন?

গৃহস্থঘর; দুটো সিদ্ধ করে রাখতে দোষ কি?

ললনা কাতর হইয়া বলিল, সত্যি কথা বল না মা, কি হয়েচে?

কি আর হবে?

তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে আর লুকিয়ো না, মা। ললনা পায়ে হাত দিতে যাইতেছিল, জননী তাহা ধরিয়া ফেলিল। আরো একটু নিকটে আসিয়া তাহার কপালের উপর চুলগুলি কানের পাশে গুঁজিয়া দিতে দিতে প্রসন্নমুখে বলিল, একজনের বেশি ভাত নেই; তিনি যদি আসেন, তাই—

তাই বুঝি তুমি শুধু সজনে পাতা চিবিয়ে থাকবে?

শুভদা পূর্ব্বের মত ঈষৎ হাসিয়া বলিল, সজনে পাতা কি অখাদ্য?

অখাদ্য নয় বলে কি শুধু খায়?

তা হোক। তখন তুই ত বললি ললনা, সুসময় অসময় কার ঘরে নেই ! তাই অসময়ে সুসময়ের কথা মনে রাখতে নেই। আবার যখন ভগবান মাপবেন, তখন আবার সব হবে। তখন—এবার শুভদার চক্ষেও জল আসিয়া পড়িল।

ললনা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জননীর পদপ্রান্তে একরাশি সজিনার পাতা ফেলিয়া দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে। একজন ভিক্ষুক অনেকক্ষণ ধরিয়া বামুনপাড়ার একটি ক্ষুদ্র মুদির দোকানের একপার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দোকানটি ক্ষুদ্র। দুই–এক পয়সার খরিদ্দার ভিন্ন অন্য কেহ বড় একটা এস্থানে আইসে না। কত লোক আসিতেছে; এক পয়সার তৈল কিনিতেছে, দুই পয়সার দাল কিনিতেছে, সিকি পয়সার লবণ কিনিতেছে, তাহার পর চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, ভিক্ষুক কিন্তু কোন কথাই কহে না; ক্রয়–বিক্রয় দেখিতেছে ও দাঁড়াইয়া আছে.। বহুক্ষণ পরে দোকানদারের চক্ষু সেদিকে পড়িল; তাহার পানে চাহিয়া বলিল, তুমি কি নেবে গা?

ভিক্ষুক মাথা নাড়িয়া বলিল, কিছু না।

দোকানদার বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে মিছে এখানে দাঁড়িয়ে ভিড় বাড়িও না।

এইসময় একজন খরিদ্দার বলিয়া উঠিল, ও বুঝি ভিক্ষে করতে এসেছে !

দোকানদার অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, যাও যাও, এখানে কিছু মিলবে না। সন্ধ্যার সময় আবার ভিক্ষে কি?

লোকটা চলিয়া গেল। কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ঠিক পূর্বস্থানে দাঁড়াইল। দোকানদার মুখপানে চাহিয়া বলিল, আবার এলে যে?

চাল কিনবে?

কি চাল? কত করে?

মোটা চাল।

কৈ দেখি?

লোকটা একটা ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া বলিল, এই দেখ।

দোকানদার দ্রব্য দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল—এ যে ভিক্ষে করা চাল। ক’টা পয়সা নিবি?

চাউল–বিক্রেতা দোকানদারের মুখপানে চাহিয়া বলিল, দু’ আনা?

ইস্—চারটে পয়সা দাম হয় না, আবার দু’আনা? আমি নিতে চাইনে।

লোকটাকে বোধ হয় চিনাইয়া দিতে হইবে না। ইনি আমাদের হারাণচন্দ্র !

হারাণচন্দ্র নিকটবর্তী একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া দোকানদারের বাপান্ত করিতে করিতে পুঁটুলি খুলিয়া মুঠা মুঠা চাল চর্বণ করিতে লাগিল। এত চাল কি চার পয়সায় দেওয়া যায়? সমস্ত দিনের মেহনতের দাম কি চার পয়সা? আড্ডাধারীর কাছে নিয়ে যাই ত চারদিনের মৌতাত যোগায়, কিন্তু সেখানে কি যাওয়া যায়? ছিঃ—ব্যাটারা ভিক্ষে-করা চাল চিনে ফেলবে। তা হলে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—বাড়ি নিয়ে যাব? কিন্তু এ ক'টি চাল কার মুখে দেব? কাজ নেই—

হারাণচন্দ্র পুঁটুলিটি গুছাইয়া বাঁধিয়া আবার সেই দোকানে আসিয়া দাঁড়াইল। দোকানদারকে ডাকিয়া বলিল, চাল নাও।

চার পয়সায় দিবি ত?

হাঁ।

তবে ঐ ধামাতে ঢেলে দে।

হারাণচন্দ্র একটা পাত্রে চালগুলি ঢালিয়া দিয়া হাত পাতিল। দোকানদারের নিকট চারিটি পয়সা গ্রহণ করিয়া কিয়দ্দূরে আসিয়া হারাণচন্দ্র একচোট খুব হাসিয়া লইল।—কেমন ব্যাটাকে ঠকিয়েছি, হারামজাদার যেমন কর্ম তেমন ফল দিয়েছি। অর্ধেক চাল খেয়ে ফেলেছি ব্যাটা ধরতেও পারেনি। দোকানদার যে ধরিবার চেষ্টা পর্যন্ত করে নাই হারাণচন্দ্র তাহা একবারও মনে করিল না। মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে গুলিখানার ঝাঁপ খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

আর কাজ নাই; আমরা অন্যত্র যাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আর ত পারি নে মা!

তিনদিন উপবাস করিয়া শুভদা কন্যা ললনার গলা ধরিয়া রুদ্ধাবেগে কাঁদিয়া ফেলিল।

ললনা সযত্নে মাতৃ–অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া দিয়া বলিল, কেন মা অমন কর, এদিন কিছু চিরকাল থাকবে না—আবার সুদিন হবে।

শুভদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়, কিন্তু আর ত সয় না। চোখের উপর তোদের এত দুর্দশা মা হয়ে আর দেখতে পারিনে। আমি মা–গঙ্গার কোলে ডুব দিই, তুই মা যেমন করে পারিস এদের দেখিস। দোরে দোরে ভিক্ষে করিস—উঃ—মা হয়ে আর পারিনে।

শুভদা যেরূপভাবে ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল, যেরূপভাবে কন্যার গলা জড়াইয়া ধরিল তাহা দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। সে আজ অনেকদিনের পর আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে; অনেক সহ্য করিয়া ধৈর্যচ্যুত হইয়াছে, তাই আজ তাহাকে সামলাইতে পারা যাইতেছে না। যে কখনও ক্রোধ করে না, সে ক্রোধ করিলে বড় বিষম হয়; যে বড় শান্ত, তাহাতে ঝড় উঠিলে বড় প্রলয়ঙ্করী হইয়া উঠে; তাই ললনা বড় বিপদে পড়িয়া গিয়াছে। কোনরূপে বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছে না যে, এমন করিলে সে আর বরদাস্ত করিতে পারিবে না। বুকখানা যদি ফাটিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

গভীর রাত্রে মাতাপুত্রী সেইখানে লুটাইয়া লুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

শুভদার স্বামীর জন্য বড় ভয় হইয়াছে। আজ ছয়দিন হইল তিনি বাটী আসেন নাই। তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি অপমানে ও লাঞ্ছনার ভয়ে তিনি আত্মঘাতী হইয়াছেন। অপদার্থ বলিয়া কন্যা হইয়াও ছলনা সেদিন যেরূপ

অপমানিত করিয়াছিল, যেরূপ গঞ্জনা দিয়াছিল, তাহাতে আত্মঘাতী হওয়া আশ্চর্যের কথা নহে। সেই কথাই অষ্টপ্রহর মনে হইতেছে। আজও নিশাশেষে শুভদা চমকাইয়া উঠিয়া বসিল, ললনাকে তুলিয়া বলিল, ওরে তিনি নাই।

ললনা ঘুমের ঘোরে ভাল বুঝিতে পারিল না, তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, কে মা?

আমি স্বপন দেখছিলাম যে তিনি আর নাই।

কেন মা অমন কর? কথা শেষ করিয়াই ললনা কাঁদিয়া ফেলিল। যতটুকু রাত্রি অবশিষ্ট ছিল তাহা দুজনেই কাঁদিয়া শেষ করিল।

ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল। বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে কৃষ্ণঠাকুরানী স্নান করিয়া গৃহাভিমুখে যাইবার সময় পথিপার্শ্বে মুখুজ্যেবাটীতে একবার প্রবেশ করিয়া অঙ্গন হইতে ডাকিলেন, বৌ!

শুভদা বাহিরে আসিয়া বলিল, কি ঠাকুরঝি? ব'স।

আর বসব না দিদি—বেলা হল। নেয়ে যাবার সময় একবার মনে করলাম, বৌকে দেখে যাই।

শুভদা মৌন হইয়া রহিল।

কৃষ্ণঠাকুরানী গলাটা একটু খাট করিয়া বলিলেন, বৌ একবার শুনে যাও ত।

শুভদা নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, হারাণের কোন খবর পেলি?

শুভদা বলিল, না।

আজ কতদিন সে বাড়ি আসেনি?

ছ' দিন হল।

ছ' দিন আসেনি? বামুনপাড়ায় কারুকে পাঠাস নি কেন?

কাকে পাঠাব? কে যাবে?

তাও বটে, আমাকে বলিস নি কেন?

শুভদা উত্তর দিল না।

জলের কলসীটি নামিয়া আসিতেছিল; সেটাকে একটু তুলিয়া ধরিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন, হাতে কিছু টাকাকড়ি আছে কি?

কিছু না।

তবে সংসার চলচে কেমন করে?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

ছেলেটা কেমন আছে?

সেই রকমই।

এখন ললনাকে একবার আমার বাড়ি পাঠিয়ে দিস।

তিনি প্রস্থান করিলে শুভদা ললনাকে ডাকিয়া বলিল, কেষ্টঠাকুরঝি তোকে একবার ডেকে গেছেন, একবার যা।

কেন?

তা জানিনে।

ললনা কৃষ্ণপ্রিয়ার উদ্দেশে প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া মাতার হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিল, পিসিমা দিলেন।

শুভদা মুদ্রা দুইটি অঞ্চলে বাঁধিয়া বলিল, আর কিছু বললেন কি?

হাঁ, বাবা এলে তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়।

শুভদা সেদিন ঠাকুরের উদ্দেশে অনেক প্রণাম করিল, পূজার কক্ষস্থিত কালীপট প্রতি বহুক্ষণাবধি যুক্তকরে চাহিয়া রহিল, তুলসীতলায় অনেক মাথা খুঁড়িল, তাহার পর জিনিসপত্র আনাইতে দিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল।

সেদিন যথাসময়ে মনোমত আহার পাইয়া ছলনাময়ী মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে পুতুলের বিবাহের সম্বন্ধ করিতে ও-পাড়ায় ললিতার নিকট প্রস্থান করিল।

রাত্রে একটু আঁধার হইলে, অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া আজ সমস্ত দিনের পর হারাণচন্দ্র বাটী প্রবেশ করিলেন। ছয় দিবস পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন, আজো তেমনি আছেন, কিছুই পরিবর্তন হয় নাই। পরিবর্তন হইয়াছে শুধু বস্ত্রখানার। বর্ণটা অঙ্গার অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এবং গুণিয়া দেখিলে বোধ হয় শতাধিক স্থানে গাঁইট-বাঁধা দেখিতে পাওয়া যাইত। সময়ে যথামত তাঁহাকে আহারাদি করাইয়া শুভদা কন্যা ললনাকে ডাকিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, মা, রোজ যেন তোর মুখ দেখে উঠি—

ললনাও একটু হাসিল—কেন মা?

আজ যে সুখ পেলাম, জন্মেও এমন পাইনি।

পরদিন প্রাতঃকালে ললনা কৃষ্ণপিসিমাকে যাইয়া বলিল, কাল রাতে বাবা এসেছেন।

কৃষ্ণার মুখ প্রফুল্ল হইল; যেন বড় একটা দুর্ভাবনা তিরোহিত হইল। স্মিতমুখে বলিলেন, এসেচে? ভাল আছে?

হাঁ।

এতদিন কোথায় ছিল?

তা জানিনে।

বৌ জিজ্ঞাসা করেনি?

না।

তোর পিসিমা কিছু বলেনি?

না। তিনি ত বাবার সঙ্গে কথা কন না।

কথা কন না? কেন?

তা জানিনে। পিসিমাই জানেন।

বেলা এগারটার সময় কৃষ্ণপ্রিয়া কলাপাতা-চাপা একটা পাথরের বাটি হাতে করিয়া শুভদার নিকট আসিয়া বলিল, বৌ, একটু তরকারি এনেচি, হারাণকে দিস।

শুভদা বাটিটি হাতে লইয়া পার্শ্ববর্তী একটা ঘর উদ্দেশ করিয়া বলিল, ঐ ঘরে আছেন।

কৃষ্ণপ্রিয়া বুঝিতে পারিয়া বলিল, তা হোক, এখন আর যাব না, ঘরে সমস্ত জিনিস আদুড় পড়ে আছে।

কৃষ্ণপ্রিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু অর্ধ উঠান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুভদাকে বলিলেন, বৌ, হারাণকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারবি?

কি?

এতদিন সে কোথায় ছিল?

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

খাওয়াইতে বসাইয়া শুভদা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন কোথায় ছিলে?

হারাণচন্দ্র মলিনমুখে অধোবদন হইয়া বলিলেন, গাছতলায়।

শুভদা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

পরদিন দুপুরবেলা কৃষ্ণপ্রিয়া আবার আসিলেন। নানা কথাবার্তার পর বলিলেন, বৌ, সেকথা জিজ্ঞাসা করেছিলি?

হাঁ।

কি বললে?

বললেন যে, গাছতলায় ছিলাম।

আবার অন্যান্য কথাবার্তা চলিতে লাগিল। উঠিবার সময় কৃষ্ণপ্রিয়া কাপড়ের নীচ হইতে দু’খানা থান কাপড় বাহির করিয়া বলিলেন, ঘরে ছিল তাই নিয়ে এলাম। হারাণকে পরতে দিস।

শুভদা তাহা হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ মৃদুস্বরে বলিলেন, দেখ বৌ, হারাণ যদি জিজ্ঞাসা করে, কে দিয়েচে, তা হলে আর কারো নাম করিস। আমার নাম করিস নে।

শুভদা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেন?

কৃষ্ণপ্রিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, না অমনি।

আর যদি নাম করি?

এবার কৃষ্ণপ্রিয়াও সহাস্যে বলিলেন, তা হলে তোর কেষ্টঠাকুরঝির মাথা খাবি।

আবার একদিন–দুইদিন করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। হারাণচন্দ্র এবার আসিয়া অবধি আর বাটীর বাহির হন না। শুভদার সে পক্ষে কিছু ভয় দূর হইয়াছে; কিছু দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে, কিন্তু সংসার চলে কিরূপে? দুর্ভাবনার মূল হইয়াছে এইখানেই। কে একদিন একটাকা দান করিল, কে আর–একদিন দুই টাকা ভিক্ষা দিল, এমন করিয়া কি একটা পরিবার প্রতিপালিত হয়? ভাবনার কথা কি শুধু ইহাই? মাধবের মুখ দেখিলে ত শরীরের অর্ধেক রক্ত জল হইয়া যায়; তাহার উপর ছলনা। সে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে; বিবাহের বয়স হইয়াছে, এমন কি দুই–চারি মাসের মধ্যে হয়ত সে–বয়স উত্তীর্ণ হইয়াও যাইতে পারে। এদিকে চাহিলে শুভদা আর কূলকিনারা দেখিতে পায় না। মাধবের নিকট পার আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে ছলনার নিকট পার নাই। তাহার মুখ দেখিলে রক্ত জল হইয়া যায়, কিন্তু ইহার মুখ দেখিলে শরীরের অস্থিপঞ্জর পর্যন্ত তরল হইয়া পড়িবার উপক্রম করে। দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় শুভদা যে প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে, তাহা আর কেহ না দেখিতে পাইলেও ললনা দেখিতে পাইত। গঙ্গার ঘাট হইতে এক কলসী জল আনিতে জননী যে হাঁপাইতে থাকেন, ললনা তাহা দেখিতে পাইত; তরকারি কুটিবার সময় আলু–পটলের খোসা ছাড়াইতে গিয়া হাত

আটকাইয়া বাধিয়া যায়, ললনা তাহা জানিতে পারিত; গ্রামে শুভদার মত কেহ সুপারি কাটিতে পারিত না, সেই শুভদার সুপারি কাটা আজকাল সরু–মোটা হইয়া যায়,

ললনা তাহা বুঝিতে পারিত; আহার কমিয়া গিয়াছে, দুইবেলার পরিবর্তে আজকাল বেলা চারিটার সময় একবার দাঁড়াইয়াছে; পীড়াপীড়ি করিলে বলে আদতে ক্ষুধা নাই। ললনা এসব দেখিত আর লুকাইয়া চক্ষু মুছিত; কখন কখন ঘরে দ্বার দিয়া মাথা কুটিত। ইহাতে ফল হইবার হইলে হইতে পারিত, কিন্তু জগতে তাহা হয় না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আজ একাদশী। ললনা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, জননী রন্ধন করিতেছেন। চুলার ভিতর দেখিল কি একটা পদার্থ দগ্ধ হইতেছে। চিনিতে না পারিয়া বলিল, ওটা কি মা? কি পোড়াচ্চ?

চারটি সরষের ফুল।

কি হবে?

ছলনা খাবে। আজ নেয়ে আসবার সময় ক্ষেত থেকে তুলে এনেছিল। ভেজে দিতে বলেছিল; কিন্তু তেল ত নেই, তাই কলাপাত জড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্চি।

ললনা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

আহারের সময় সাধের সরিষার ফুলের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া ছলনাময়ী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, এই বুঝি ভাজা হয়েছে? এ ছাই হয়েছে।

শুভদা ইতস্ততঃ করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, একটু পুড়ে গেছে।

আমি খেতে চাইনে, তুমি বুঝি পোড়া জিনিস ভালবাস, তাই নিজের মনের মত করে পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে রেখেচ! তা তুমিই খেয়ো—এই রইল। ছলনা মুখখানা তোলো হাঁড়ির মত করিয়া পাতের নীচে নামাইয়া রাখিল।

ছলনা যাহা বলিল তা নিজের বিশ্বাসমত বলিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আপনার মনোমত কোন দ্রব্য না হইলে কর্কশ কথা বলিতে তাহার মত কেহই পারে না।

অনেক গজগজ করিয়া ছলনা আহার করিয়া চলিয়া যাইলে ললনা বলিল, মা, দিন দিন ছলনা মন্দ হয়ে যাচ্চে; ওকে কিছু বল না কেন? আমার ত ওকে কোন কথা বলতে সাহস হয় না। একটা বললে দশটা শুনিয়ে দেয়।

শুভদা একটু ভাবিয়া বলিল, সব মেয়ে কি তোর মত হয় মা? হাতের পাঁচটা আঙ্গুল পাঁচ রকমের হয়। আমি খাওয়াতে পারিনে, পরাতে পারিনে—কাজেই রাগ করে দুটো কথা বললে সয়ে যেতে হয়।

কিন্তু একি ভাল?

ভাল নয় তা জানি। কিন্তু কি করব? আমার সময় ভাল হলে ছলনাও বলত না, আমাকেও শুনতে হত না।

ললনা বুঝিল জননীর কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে।

পরদিন প্রায় এই সময়েই সে অত্যন্ত বিষণ্নমুখে জননীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

শুভদা মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি হল?

ললনা একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, কৃষ্ণপিসিমা বললেন, আর কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই। তোমার বাবাকে কিছু উপায় করতে বল, না হলে আমি দুঃখী মানুষ আর টাকাকড়ি কিছুই দিতে পারব না।

সকল কাজকর্ম সেদিনের মত সম্পন্ন হইলে ললনা মাধবের নিকট আসিয়া বসিল।

মাধব বলিল, দিদি, তার কি হল?

কার কি মাধু?

মাধু একটু থামিয়া বলিল, সেখানে যাবার?

ললনাও অল্প থামিল, অল্প চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, সেই কথাই আজ তোকে বলব মাধু।

মাধব আগ্রহে একেবারে উঠিয়া বসিল—কি দিদি? কবে যাওয়া হবে?

আমি কাল যাব।

কাল যাবে? আর আমি?

আমি আগে যাই, তার পরে যেয়ো।

মাধব ব্যস্ততাসহ বলিল, কেন একসঙ্গেই যাই চল না !

ললনা বলিল, না, তা হলে মা বড় কাঁদবেন।

মাধব ক্ষুণ্ণ হইল—কাঁদুক গে।

ছিঃ তা কি হয়? আমি যাই।

আবার কবে আসবে?

তুমি যেদিন যাবে, সেইদিন আর একবার আসব।

তার মধ্যে আর আসবে না?

না।

আমি কবে যাব?

আমি যেদিন নিতে আসব।

আসবে?

হাঁ।

তুমি গেলে মা কাঁদবেন?

বোধ হয়।

মাধব কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া বলিল, দিদি, তবে কাজ নেই।

কেন ভাই?

মা কাঁদবে মনে হলে আমার ওখানে যেতেই ইচ্ছে হয় না।

তবে তুই যাবিনে?

মাধব আবার কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, হ্যাঁ যাব।

তবে আমি কাল যাব?

যেয়ো।

আমাকে না দেখতে পেলে কাঁদবি নে?

কবে আমাকে নিতে আসবে?

আর কিছুদিন পরে।

তবে যাও, আমি কাঁদব না।

মাধবের অলক্ষিতে ললনা দুই-এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। সস্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, আমি গেলে এসব কথা মাকে বলো না।

না।

মা যখন যা বলবেন, তাই শুনো—কিছুতে যেন মার মনে কষ্ট না হয়। ঠিক সময়ে ওষুধ খেয়ো।

খাব।

কিছুক্ষণ থামিয়া ললনা আবার বলিল, মাধু, সদাদাদাকে তোমার মনে আছে?

আছে।

তিনি যদি আসেন—যদি তোমাকে দেখতে আসেন—

তা হলে?

তা হলে ব'লো যে দিদি চলে গেছে। কেউ যখন না থাকবে তখন ব'লো।

আচ্ছা।

এইসময় শুভদা আসিয়া বলিলেন, অনেক রাত হয়েচে, তুই শুগে যা মা।

মাধব সে কথার উত্তরে বলিল, মা, দিদি আজ আমার কাছে শোবে।

দিদিকে ছাড়িতে মাধবের তখন কিছুতেই ইচ্ছা ছিল না। শুভদা বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়া ললনাকে বলিলেন, তবে তাই শোও—আমি ওপরে ছলনার কাছে শুই গে।

শুভদা চলিয়া গেলেও ভ্রাতা-ভগিনীর অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা চলিল, তাহার পর মাধবচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতঃকালে ললনাকে কেহ দেখিতে পাইল না। সকালবেলায় সে যেসকল গৃহকর্ম করে তাহা এখন পর্যন্ত পড়িয়া আছে। বেলা আট-নয়টা বাজে

দেখিয়া শুভদা মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর দিদি কোথায়? ছলনাকে বলিলেন, তোর দিদি কোথায় গেল?

সবাই বলিল, বলিতে পারি না।

বেলা অধিক হয় দেখিয়া শুভদা সমস্ত কর্ম নিজেই করিতে লাগিলেন; ছলনাও সেদিন অনেক সাহায্য করিল। আহার্য প্রস্তুত হইল, সকলে আহার করিল—দ্বিপ্রহরও অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি ললনার দেখা নাই।

রাসমণি খুঁজিতে গেলেন, ছলনাময়ীও আহার করিয়া পাড়া বেড়াইতে গেল, সেখানে যদি ললনা থাকে ত পাঠাইয়া দিবে। সন্ধ্যার পূর্বে রাসমণি আসিয়া বলিলেন, কোথাও ত তাকে পেলাম না—বাড়ি এসেচে কি?

কই না।

সন্ধ্যার পর ছলনাও ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দিদি এ গাঁয়ে নেই।

রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইতে লাগিল, কিন্তু ললনা আসিল না।

হারাণবাবু ফিরিয়া আসিয়া অবধি বাটীর বাহির হন নাই; তিনিও, তাই ত মেয়েটা গেল কোথা, বলিয়া একবার খুঁজিতে বাহির হইলেন। রাত্রি বারোটার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তাই ত, তাই ত—কিছুই যে বোঝা যায় না।

সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া শুভদা কাঁদিতে লাগিলেন; রাসমণি কাঁদিতে লাগিলেন, ছলনাও কাঁদিল, শুধু মাধবচন্দ্র বড় একটা কিছু বলিল না। সকলের ব্যস্ততা এবং ক্রন্দনাদি দেখিয়া সে একবার কথাটা ভাঙ্গিতে গিয়াছিল, কিন্তু দিদির নিষেধ মনে করিয়া জননীর অশ্রু দেখিয়াও মৌন হইয়া রহিল।

পরদিন আসিল। সূর্য উঠিল, অস্ত গেল—রাত্রি হইল। আবার প্রভাত হইল, সূর্য উঠিল অস্ত গেল, কিন্তু ললনা আসিল না। গ্রামের সকলেই একথা শুনিল। ললনাকে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত, তাই তাহার জন্য সকলেই দুঃখিত হইল। কেহ কাঁদিল, কেহ শুভদাকে বুঝাইতে আসিল, কেহ পাঁচরকম অনুমান করিতে লাগিল, এইরূপে চারি-পাঁচদিন অতিবাহিত হইল।

শুভদা প্রথমে মাধবচন্দ্রের সম্মুখেও ললনার জন্য কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার কথা মনে হইল তখন সমস্ত অশ্রু প্রতিষেধ করিল। জননীর অধিক ক্লেশ দেখিলে বোধ হয় সে ভিতরের কথা বলিয়া ফেলিত, কিন্তু যখন দেখিল সব থামিয়া গিয়াছে তখন আর কোন কথা কহিল না।

কিন্তু শুভদা বড় বিস্মিত হইল। বড়দিদির কথা মাধব কেন জিজ্ঞাসা করে না? একবারও বলে না, দিদি কোথায়? একবারও জিজ্ঞাসা করে না, বড়দিদি আসে না কেন? শুভদার অল্প সন্দেহ হইত—মাধব বোধ হয় কিছু জানে; কিন্তু সাহস করিয়া সেকথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

আজ ছয় দিবস পরে নন্দ জেলেনী গঙ্গায় মৎস্য ধরিতে ধরিতে আঘাটায় একটা চওড়া লালপেড়ে কাপড় অর্ধ জলে, অর্ধ স্থলে, বালুমাখা পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল। হারাণবাবুর বাটীর নিকটেই তাহার বাটী; সে ললনাকে ঐ কাপড় অনেকদিন পরিতে দেখিয়াছিল। তাহার সন্দেহ হইল বোধ হয় ঐ বস্ত্র ললনার হইতে পারে। সে আসিয়া একথা রাসমণিকে জানাইল। তিনি ছুটিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন, চিনিতে বিলম্ব হইল না—তাহা ললনারই বটে। কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানা বাটীতে তুলিয়া আনিলেন; শুভদা দেখিলেন, হারাণচন্দ্র দেখিলেন, ছলনা দেখিল, পাড়ার আরো পাঁচজন দেখিল—ঠিক তাহাই বটে! সে কাপড় ললনারই। তাহার হাতের সেলাই করা, তাহার হাতের তালি দেওয়া, তাহার হাতের এককোণে লাল সূতা দিয়া নাম লেখা। আর কি ভুল হয়? শুভদা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল! গ্রামময় প্রচার হইয়া গেল মুখুজ্যেদের ললনা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নারায়ণপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর একদিন মনে হইল তাঁহার শরীর খারাপ হইয়াছে, বায়ু-পরিবর্তন না করিলে হয়ত কঠিন পীড়া জন্মাইতে পারে। সুরেন্দ্রবাবুর অনেক আয়। বয়স অধিক নহে; বোধ হয় পঞ্চবিংশতির অধিক হইবে না; এই বয়সে অনেক শখ, তাই পাত্রমিত্রের অভাব নাই। দুই-চারিজনকে ডাকাইয়া বলিলেন, আমার শরীর বড় খারাপ হইয়াছে—তোমরা কি বল? সকলেই তখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল যে, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। তাহারা অনেক দিন হইতে একথা বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু পাছে তাঁহার ক্লেশ বোধ হয় এই জন্যই সাহস করিয়া বলে নাই।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, ডাক্তারি ঔষধ ব্যবহার করিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না, আমার বিশ্বাস বায়ু-পরিবর্তন করিলেই সব আরোগ্য হইয়া যাইবে।

ইহাতেও কাহারো সন্দেহ ছিল না। বায়ু-পরিবর্তনের মত ঔষধ আর নাই বলিলেও চলে।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, তোমরা বলিতে পার কোন্ স্থানের বায়ু সর্বাপেক্ষা উত্তম? তখন অনেকে অনেক স্থানের নাম করিল।

সুরেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি বলি কিছুদিন জলের উপর বাস করিলে হয় না?

সকলে বলিল, ইহা অতি চমৎকার কথা।

তখন জলযাত্রার ধুম পড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড একখানা বজরা নানারূপে সজ্জিত হইতে লাগিল। দুই-তিনমাসের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইতে পারে সমস্ত বোঝাই করা হইল। তাহার পর দিন দেখিয়া পাঁজি খুলিয়া সুরেন্দ্রবাবু

নৌকায় উঠিলেন। সঙ্গে ইয়ারবন্ধু, গায়ক বাদক অনেক চলিল, তন্মধ্যে একজন গায়িকারও স্থান হইল। মাঝিরা পাল তুলিয়া ‘বদর’ বলিয়া রূপনারায়ণ নদে বজরা ভাসাইয়া দিল।

অনুকূল বাতাসে পালভরে বৃহৎ বজরা রাজহংসীর ন্যায় ভাসিয়া চলিল। স্থানে স্থানে নোঙ্গর করা হইতে লাগিল; সুরেন্দ্রবাবু সদলবলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে জলে স্থলে অনেক স্থান পরিভ্রমণ করা হইল, অনেকদিন কাটিয়া গেল; তাহার পর বজরা কলিকাতায় আসিয়া লাগিল। অপরাপর সকলের ইচ্ছা ছিল এইস্থানে যেন অধিকদিন থাকা হয়।

কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু তাহাতে অমত করিয়া বলিলেন, কলকাতার বায়ু অপেক্ষাকৃত দূষিত, এখানে থাকিব না। বজরা উত্তরাভিমুখে চালাও। সুতরাং একদিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া বজরা উত্তরমুখে চলিল।

বজরা যখন কলিকাতা ছাড়িয়া চলিল তখন তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা মনে করিতে লাগিল যে, অনেকদিন বজরায় বাস করা হইয়াছে, বহুত জলকণাসম্পৃক্ত স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া শরীরে আরাম এবং স্বাস্থ্যের উৎকর্ষতা সাধন করা হইয়াছে, এখন বাটী ফিরিয়া গিয়া স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির মুখ দেখিতে পারিলে শরীরের কান্তিটা সম্ভবতঃ আরো একটু বৃদ্ধি পাইতে পারিবে। এই হিসাবে আর অধিক দূর যাইতে অনেকেই মনে মনে অনিচ্ছুক হইল; আর দুই-একদিন পরে মুখ ফুটিয়া দুই-একজন বলিয়াও ফেলিল, অনেকদিন দেশ ছাড়িয়া আসা হইয়াছে— আপনার শরীরও সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে—এখন ফিরিলে হানি কি?

সুরেন্দ্রবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, হানি কিছুই নাই, কিন্তু এখন ফিরিব না, তোমাদের যদি বাড়ির জন্য মন খারাপ হয়ে থাকে ত তোমরা যাও।

সামান্য বাড়ির জন্য, তুচ্ছ স্ত্রী-পুত্রের জন্য মন খারাপ হইয়া যাওয়া কাপুরুষতা মনে করিয়া, যাহারা কথা পাড়িয়াছিল তাহারা চুপ করিয়া গেল। সুরেন্দ্রবাবুও আর অন্য কথা বলিলেন না।

বজরা থামিয়া থামিয়া পুনর্বার চলিতে লাগিল; ভিতরে কিন্তু আর পূর্বের মত সুখ নাই। সুরেন্দ্রবাবু ভিন্ন অনেকেই প্রায় বিষণ্ণভাবে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিল। তখন দুই দিবস পূর্বে কাপুরুষতা মনে করিয়া যাহারা কথা পাড়িয়াও চাপিয়া গিয়াছিল, তাহারা পৌঁরুষের গর্ব ছাড়িয়া দিয়া আবার সেই কথা পাড়িবার অবসর খুঁজিতে লাগিল। প্রবাসে থাকিয়া বাটী যাইবার কথা—স্ত্রী-পুত্রের মুখ মনে পড়িয়া সেইখানে ফিরিয়া যাইবার একবার বাসনা হইলে তাহা আর কিছুতেই দমন করিয়া রাখা যায় না। একদিবস অতিবাহিত হইতে না হইতেই মনে হয় যেন এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তাহাদেরও তাহাই হইল। আর তিন-চারি দিনে প্রায় সকলেই লজ্জার মাথা খাইয়া বাটী ফিরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

সুরেন্দ্রবাবু আপত্তি করিলেন না; তখন বজরা চন্দননগর অতিক্রম না করিতেই প্রায় সকলেই প্রস্থান করিল। ভৃত্যবর্গ ভিন্ন বজরা প্রায় শূন্য হইয়া গেল। বাইরের লোকের মধ্যে কেবল একজন পশ্চিমাঞ্চল-নিবাসী বাদক ও একজন অনুগৃহীতা নর্তকী রহিল। বাবু তাহাদের লইয়াই চলিলেন—দেশে ফিরিবার কথা একবারও মনে করিলেন না।

একদিন বৈকালে সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বেই পশ্চিমদিকে মেঘ করিয়া আসিতে লাগিল। সুরেন্দ্রবাবু একজন মাঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, হরিচরণ, মেঘ করিয়া আসিতেছে দেখিয়াছ?

আজ্ঞে হাঁ।

ঝড় হইবে বলিয়া বোধ হয় কি?

বৈশেখ-জোষ্টি মাসে ঝড় হওয়া আশ্চর্য কি বাবু?

তবে বজরা বাঁধ।

এখানে কিন্তু গাঁ আছে বলে মনে হচ্চে না; আঘাটায় লাগাব কি?

লাগাবে না ত কি ডুবে মরব?

মাঝি একটু হাসিয়া বলিল, আমি থাকতে সে ভয় নেই বাবু। ঝড় আসবার আগেই লঙ্গর করব।

সুরেন্দ্রবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অত সাহস করিয়া কাজ নাই—তুমি কাছি কর।

অগত্যা হরিচরণ একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থান বাছিয়া লইয়া বজরা বাঁধিয়া ফেলিল।

সুরেন্দ্রবাবু বজরার ছাদের উপর আসিয়া বসিলেন। ভৃত্য তামাকু সাজিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। বাবু গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, একবার ওস্তাদজীকে ডেকে দে।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন পশ্চিমবাসী হিন্দুস্থানী মাথায় একহস্ত উচ্চ পাগড়ি বাঁধিয়া দাড়িটা কর্ণমূলে জড়াইয়া, গোঁফ মুচড়াইতে মুচড়াইতে আসিয়া বলিল, হুজুর!

সুরেন্দ্রবাবু পরপারে তীরের অনতিদূরে জলের উপর কালো মত কি একটা পদার্থ ভাসিয়া আছে, তাহাই দেখিতেছিলেন। পদার্থটা একটা মনুষ্য-মস্তক বলিয়া বোধ হইতেছিল—তাহাই মনোযোগ করিয়া দেখিতেছিলেন। ওস্তাদজীর শব্দ প্রথমে কর্ণে প্রবেশ করিল না।

ওস্তাদজী উত্তর না পাইয়া আবার বলিল, হুজুর!

সুরেন্দ্রবাবু ফিরিয়া চাহিলেন। ওস্তাদজীকে দেখিয়া বলিলেন, ওস্তাদজী, এখন বোধ হয় ঝড় আসিবে না; একটু গীতবাদ্য হউক।

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, যো হুকুম।

সুরেন্দ্রবাবু আবার সেই পদার্থটা দেখিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই একজন যুবতী আসিয়া নিকটে একখানা গালিচার উপর উপবেশন করিল। পশ্চাতে ওস্তাদজী বাঁয়াতবলা হাতে করিয়া ছাদের উপর

উঠিতেছিল; সুরেন্দ্রনাথ দেখিয়া বলিলেন, ওস্তাদজী, তুমি নীচে যাও—বাজনায় আর কাজ নেই; আজ শুধুই গান হউক।

ওস্তাদজী একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া নামিয়া গেল।

ইতিপূর্বে যে স্ত্রীলোকটি গালিচার উপর আসিয়া বসিয়াছিল তাহার নাম জয়াবতী; বয়সে বোধ হয় বিংশতি হইবে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুডৌল শরীর—দেখিতে মন্দ নহে; বহুদিবস হইতে সুরেন্দ্রবাবুর অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, সাজসজ্জার আড়ম্বর বেশি কিছু ছিল না। একখানা দেশী কালাপেড়ে শাটি ও দুই-একখানা গহনা পরিয়া শিষ্টশান্ত ঘরের বধূটির মত স্থির হইয়া বসিয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু তাহার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, জয়া, আজ যে তোমাকে সমস্ত দিন দেখি নাই?

মাথার বেদনায় সমস্ত দিন শুয়েছিলাম।

এখন ভাল হয়েছে কি?

জয়াবতী অল্প আসিয়া বলিল, অল্প।

গান গাইতে পারবে কি?

জয়াবতী আবার হাসিল—হুকুম করুন।

হুকুম আর কি, যা ইচ্ছা হয় গাও।

জয়াবতী গীত গাহিতে আরম্ভ করিল।

সুরেন্দ্রবাবু পরপারস্থিত ভাসমান কৃষ্ণ পদার্থটার পানে চক্ষু রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে কিছুক্ষণ পরে, জয়াবতীর গান শেষ হইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিলেন, জয়া, ওটা নড়ে বেড়াচ্চে—না?

জয়াবতী গান ছাড়িয়া সেটা বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, বোধ হয়।

তবে আমার দূরবীনটা। ডাকিয়া বলিলেন, ওরে নীচে থেকে আমার দূরবীনের বাক্সটা নিয়ে আয় ত।

দূরবীন আসিলে বাক্স খুলিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সেই পদার্থটা দেখিয়া দূরবীন বাক্সবন্ধ করিয়া রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

জয়াবতী জিজ্ঞাসা করিল, কি ওটা?

একজন মানুষ বলে বোধ হয়।

এতক্ষণ ধ'রে জলে কি কচ্চে?

তা জানি নে। দেখলে হয়।

একজন লোক পাঠিয়ে দিন না।

আমি নিজেই যাব। অনুজ্ঞা মত একজন মাঝি অল্পক্ষণ পরে বজরাসংলগ্ন বোট লইয়া আসিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, ওপারে চল।

বোট কাছে আসিলে সুরেন্দ্রবাবু দেখিলেন, পদ্মের মত অনিন্দ্যসুন্দর একজন স্ত্রীলোক গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া, কাল মেঘের মত একরাশি চুল নীল জলের উপর চতুর্দিকে ভাসাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুরেন্দ্রবাবু আরও নিকটে আসিলেন, তথাপি, স্ত্রীলোকটা উঠিল না বা উঠিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিল না, যেমন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল সেইরূপভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, নিকটে কোন গ্রাম আছে কি?

স্ত্রীলোকটি বলিল, আমি বলতে পারি না। বোধ হয় নাই।

তবে তুমি এখানে কোথা হতে এলে?

স্ত্রীলোকটি চুপ করিয়া রহিল।

তোমার বাড়ি কি নিকটেই?

না; অনেক দূর।

তবে এখানে কেন?

আমাদের নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল।

কবে?

কাল রাত্রে।

তোমার সঙ্গীরা কোথায়?

বলিতে পারি না।

তুমি এতক্ষণ ধরিয়া জলে দাঁড়াইয়া আছ কেন? নিকটবর্তী কোন গ্রাম অনুসন্ধান কর নাই কেন?

সে পুনর্বার চুপ করিয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু কথার উত্তর না পাইয়া বলিলেন, তোমার বাড়ি এখান হইতে কতদূরে হইবে?

প্রায় দশ-বারো ক্রোশ।

কোন্ দিকে?

সুরেন্দ্রবাবুর বজরা যেদিকে যাইতেছিল সেইদিকটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, ঐদিকে।

সুরেন্দ্রবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি ঐদিকেই যাইব। আমার বজরায় স্ত্রীলোক আছে, যদি কোনরূপ আপত্তি না থাকে ত আমার সহিত আইস; তোমাকে বাটী পৌঁছাইয়া দিব।

আবার সে মৌন হইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু না বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, যাইবে?

যাইব।

তবে আইস।

পুনর্বার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, আমার কাপড় ভাসিয়া গিয়াছে।

এইবার সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, সে কিজন্য এতক্ষণ ধরিয়া জলে দাঁড়াইয়া আছে। নিজে তীরে নামিয়া মাঝিকে পুনরায় বজরায় ফিরিয়া গিয়া বস্ত্র আনিতে বলিয়া দিয়া বলিলেন, বস্ত্র আসিলে আমার সহিত যাইবে ত?

স্ত্রীলোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল, যাইবে।

মাঝি বস্ত্র লইয়া প্রত্যাগমন করিল, অল্পক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ সকলকে লইয়া বজরায় আসিয়া উঠিলেন।

বজরায় আসিয়া সুরেন্দ্রবাবু আগন্তুককে জয়াবতীর জিম্মা করিয়া দিলেন; সে মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া, যত্ন, আত্মীয়তা করিয়া তাহাকে আপনার কামরায় সে রাত্রের মত লইয়া গেল।

আহার করাইয়া, পান দিয়া, কাছে বসিয়া জয়াবতী কহিল, ভাই, তোমার নামটি?

আমার নাম মালতী। তোমার নাম?

জয়াবতী। তোমাদের বাড়ি?

মহেশপুরে।

এখান থেকে কত দূরে?

প্রায় দশ-বারো ক্রোশ উত্তরে।

তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথা ভাই?

মালতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কোথাও নয়।

সে কি—বিয়ে হয়নি?

হয়েছিল, কিন্তু সেসব চুকে গেছে।

জয়াবতী একটু দুঃখিতভাবে কহিল, কতদিন?

অনেক দিন। আমার সেসব কথা মনে পড়ে না।

জয়াবতী একথা চাপিয়া দিয়া বলিল, তোমাদের বাড়িতে কে আছে?

কেউ নেই। এক পিসি ছিল, তিনিও বোধ হয় বেঁচে নেই।

জয়াবতী বুঝিল নৌকাডুবির কথা আসিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এ কথারও আন্দোলন করা উচিত মনে করিল না। কহিল, তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে ভাই?

মালতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, সাগরদ্বীপে।

যারা তোমার সঙ্গে ছিল তাদের কি হল?

জানিনে।

এখন বাড়ি যাবে?

তাই ভাবচি।

জয়াবতী অল্প হাসিয়া, অল্প অপ্রস্তুতভাবে বলিল, আমার সঙ্গে যাবে?

নিয়ে গেলেই যাই। তোমার স্বামী আমার অনেক উপকার করেছেন। আর বাড়িতেও আমার কেউ নেই! বাড়ি গেলেও যে কার কাছে থাকব তা ত জানিনে।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া জয়াবতী জিভ কাটিয়াছিল; উত্তর শুনিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইল। জয়াবতীর মনে হইল—মালতীকে লইয়া যাওয়া বড় সুখের বিষয় হইবে না। সুরেন্দ্রবাবুর নিকট—

মালতী বলিল, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

নারায়ণপুরে।

কোথায় যাচ্ছিলে?

বেড়াতে। বাবুর শরীর ভাল নয়, তাই—

আরও দুই-চারিটা কথাবার্তার পর সে রাত্রের মত দুইজনে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রিটা সুরেন্দ্রবাবুর ভাল নিদ্রা হইল না, সেইজন্য অতি প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। হাতমুখ ধুইয়া গুড়গুড়ির নল মুখে লইয়া ছাদের উপর আসিয়া বসিলেন। হাওয়ার জোর ছিল, পাল তুলিয়া মাঝিমাল্লারা বজরা খুলিয়া দিল। একটু বেলা হইলে, জয়াবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, স্ত্রীলোকটির কিছু জানতে পেরেছ?

সমস্ত।

বাড়ি কোথায়?

মহেশপুরে।

মহেশপুরে কোথায়?

তা জানিনে। এখান থেকে দশ-বারো ক্রোশ উত্তরে।

বাপের নাম কি?

জিজ্ঞাসা করিনি।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, সব খবরই জেনেছ দেখচি! স্বামীর নাম কি?

স্বামী নেই।

শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

বলেনি।

সুরেন্দ্রবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, কি জাত জান কি?

না।

নাম জান?

জানি; মালতী।

মালতীর যদি আপত্তি না থাকে ত একবার আমার কামরায় ডাকতে ব'লো—আমি নিজে সব কথা জিজ্ঞাসা করব।

কিছুক্ষণ পরে একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, কামরায় আসুন।

সুরেন্দ্রবাবুও কালবিলম্ব না করিয়া কামরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীচে গালিচার উপর মালতী অধোবদনে বসিয়াছিল। জয়াবতীও নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু প্রবেশ করিবামাত্র সে প্রস্থান করিল। এ সকল সে জানিত; হয়ত তাহার সম্মুখে সব কথা না হইতে পারে, হয়ত কোন অসুবিধা ঘটিতে পারে, সে তাহা বুঝিত—তাই সরিয়া গেল, কিন্তু অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল কি না, সব কথা শুনিবার বাসনা তাহার ছিল কি না, তাহা বলিতে পারি না।

সুরেন্দ্রবাবু একটা কৌচে আসিয়া উপবেশন করিলেন। নীরবে বহুক্ষণ মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; মুখখানি বড় ম্লান, বড় বিষণ্ণ,—কিন্তু বড় মনোমুগ্ধকর বোধ হইতেছিল; বর্ণটা বড় সুন্দর, অঙ্গসৌষ্ঠব অতিশয় প্রীতিপ্রদ। তাঁহার বোধ হইল, এতটা রূপ একসঙ্গে তিনি পূর্বে কখন দেখেন নাই। বিধবা—কি জাতি?

সুরেন্দ্রবাবু মুখ ফুটিয়া বলিলেন, তোমার পিতার নাম কি?

মালতী বলিল, শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তিনি বাটীতেই আছেন?

মালতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, না; তিনি নাই।

সুরেন্দ্রবাবু বুঝিলেন তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। বলিলেন, বাটীতে আর কে আছে?

এইবার মালতী বহুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, বোধ হয় কেহই নাই।

এতদিন কোথায় ছিলে?

সেইখানেই ছিলাম, কিন্তু আমরা সাগরে যাইতেছিলাম, পথের মাঝে নৌকাডুবি হইয়াছে।

তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

কালিপাড়ায়।

সেখানে তোমার কে আছে?

হয়ত কেউ আছে, কিন্তু আমি তাহাদের চিনি না।

কখন সেখানে যাও নাই?

বিবাহের সময় একবারমাত্র গিয়াছিলাম।

সুরেন্দ্রবাবু কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, তোমার বাপের বাড়িতেও কেহ নাই, শ্বশুরবাড়িতেও কেহ নাই, অন্ততঃ তুমি জান না—তবে এখন কোথায় যাইবে?

কলিকাতায়।

কলিকাতায়? সেখানে কে আছেন?

কেহ না।

কেহ না? তবে কোথায় থাকিবে?

কাহারও বাটী অনুসন্ধান করিয়া লইব।

তাহার পর?

মালতী মৌন হইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, তুমি রাঁধিতে জান?

জানি।

কলিকাতায় কোথাও রাঁধিতে পাইলে থাকিবে?

হাঁ।

সুরেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, মালতী, কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও ঐ কাজ পাইলে করিবে কি?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

বোধ হইল যেন সুরেন্দ্রবাবু কথার উত্তরে কিছু বিমর্ষ হইলেন। আরো কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, কলিকাতায় যাহা আশা কর, অন্যস্থানে তাহার দ্বিগুণ, চতুর্গুণ পাইলেও করিবে না কি?

মালতী পূর্বের মত মাথা নাড়িল—কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও আমি যাইব না।

সুরেন্দ্রবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। ম্লান মুখ দেখিয়া মালতীও বুঝিতে পারিল যে, তাহার কথা সুরেন্দ্রবাবুর মনোমত হয় নাই, সম্ভবতঃ ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রবাবু অন্যদিকে চাহিয়া বলিলেন, যাহারা কলিকাতা চিনে না তাহাদের পক্ষে কলিকাতা অতি মন্দ স্থান; তোমার যাহা অভিলাষ করিও, কিন্তু খুব সাবধানে থাকিও। আর একটা কথা, আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী; নারায়ণপুরে বাটী, যদি কখন প্রয়োজন মনে কর আমাকে সংবাদ দিও, কিংবা আমার বাটীতে যাইও। আপদবিপদে উপকার করিলেও করিতে পারি।

মালতী অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল।

আমরা একসপ্তাহ পরে কলিকাতা অভিমুখে ফিরিব। এখন এই বজরাতেই থাক; যখন কলিকাতায় পৌঁছিব তখন নামিয়া যাইও।

সুরেন্দ্রবাবু চলিয়া যাইলে মালতী সেইখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুরেন্দ্রবাবুর কথাতে সে বেদনা পাইয়াছিল, কিন্তু কাঁদিবার আরো শত-সহস্র কারণ ছিল। সুরেন্দ্রবাবু তাহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন, বজরায় স্থান দিয়াছেন, আরো অধিক উপকার করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে করিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু সে কি রাঁধিতে মাত্র কলিকাতায় যাইতেছে? স্নেহময়ী মাতা, পীড়িত ভ্রাতা, নিঃসহায় সংসার, সে কি শুধু রাঁধিয়া নিজের উদর পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে? পাচিকার কর্ম ছল মাত্র। সে অর্থ উপার্জন করিতে চাহে এবং

কলিকাতা ভিন্ন অর্থ কোথায়? অর্থোপার্জনের পথও সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। মালতী রূপবতী; শরীরে তাহার রূপ ধরে না একথা সে টের পাইয়াছে; কলিকাতা বড় শহর। সেখানে এ রূপ লইয়া গেলে বিক্রয় করিবার জন্য ভাবিতে হইবে না, হয়ত আশাতীত মূল্যেও বিক্রয় হইতে পারে, তাই কলিকাতা যাইতে এত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। সেখানে তাহার আদর হইবে, দরিদ্র ছিল ধনবতী হইবে, ক্লেশে জীবন কাটিতেছিল এইবার সুখে কাটিবে, তথাপি মালতী কাঁদে কেন? আমরা জানি না—তাহার কথা সে-ই জানে।

পরদিন বজরা হলুদপুর গ্রামের নিম্ন দিয়া চলিতে লাগিল, মালতী খড়খড়ি খুলিয়া বাঁধাঘাটের পানে চাহিয়া রহিল। ঘাটে জনপ্রাণী নাই—যে আশায় মালতী চাহিয়া রহিল তাহা হইল না। গ্রাম ছাড়িয়া বজরা দূরে চলিয়া গেল, মালতী জানালা বন্ধ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। জয়াবতী নিকটে আসিয়া বসিল, চক্ষু মুছাইয়া সস্নেহে বলিল, কেঁদে আর কি হবে বোন? তাঁদের সময় হয়েছিল, তাই মা গঙ্গা কোলে নিয়েচেন। জয়াবতী ভাবিল, নৌকাডুবিতে যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের জন্যই মালতী কাঁদিতেছে। সে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল। জয়াবতী মালতী অপেক্ষা বয়সে বড়; তাহাকে স্নেহ করে, ছোট ভগিনীর মত দেখে; বিশেষ, মালতি কলিকাতায় নামিয়া যাইবে শুনিয়া স্নেহ আরো বর্ধিত হইয়াছিল। মালতী উঠিয়া বসিলে জয়াবতী অন্যান্য কথাবার্তায় তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাঁশীধামে মৃত্যু হইলে হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে শিবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই সদানন্দের পিসিমাতা কাশী যাইলেন, কিন্তু আর ফিরিলেন না। সদানন্দ, পুণ্যশরীরা পিসিমাতার দেহ বারাণসী ধামে গঙ্গাবক্ষে দাহ করিয়া চির-শিবলোকবাসের সুব্যবস্থা করিয়া হলুদপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

শূন্য বাটীতে অনেক রাত্রে প্রবেশ করিয়া সদাপাগলা নিজ হস্তে দুটো সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিল। একবার মনে করিল তখনই হারাণবাবুর বাটীতে গিয়া সমস্ত সংবাদ লইয়া আসিবে, কিন্তু অত রাত্রে দেখাশুনার সুবিধা না হইতে পারে মনে ভাবিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিল। কাশী থাকিয়া সে হারাণবাবুর দুশ্চরিত্রের কথা, শুভদার দুরদৃষ্টের কথা, ললনার হতভাগ্যের কথা মনে করিত; রোগের সেবা করিতে করিতে নিতান্ত ব্যস্ত থাকিয়াও সে উহাদিগকে ভুলিতে পারিত না। মধ্যে একবার পত্র লিখিয়া সংবাদ অবগত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর কোন পক্ষেই পত্রাদি লিখেন নাই—সদানন্দও তাই প্রায় একমাসকাল কোন সংবাদ জানিতে পারে নাই। দেশে ফিরিয়া আসিয়া সে সেইসব কথা মনে করিতে লাগিল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া, চালাঘরের বাতার পানে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মনে করিতে লাগিল, মেঘের উপর পদ্মফুল ফুটে কি না? ললনা বলিয়াছিল, মাটি ভিন্ন ফুল ফুটে না—সে কথা সঙ্গত কি না? আর একথা যে বলিয়াছিল, সে কেমন করিয়া জানিল মেঘের উপর পদ্ম ফুটিতে পারে না? যাহা হউক রাত্রিশেষে ঘুমাইয়া পড়িবার পূর্বে সদানন্দ স্থির করিয়া ফেলিল যে, উপরে পদ্ম ফুটিতে পারে, কিন্তু ফুটিয়া অনেকদিন থাকিতে পারে না, শুকাইয়া যাইবারই অধিক সম্ভাবনা—শুষ্ক হইয়াই যাইতেছে বোধ হয়।

পরদিন শ্রীমান সদানন্দ চক্রবর্তী ফুল, বেলপাতা, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদী ইত্যাদি বহু দ্রব্য হস্তে লইয়া একেবারে হারাণবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই শুভদাকে দেখিতে পাইল। শুভদা উঠান ঝাঁট দিতেছিল; খ্যাংরাটা নীচে ফেলিয়া দিয়া, মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া শুভদা মৃদুস্বরে বলিল, কবে এলে সদানন্দ?

কাল রাত্রে।

সকলে ভাল আছেন?

সদানন্দ দুঃখিতভাবে অল্প হাসিয়া বলিল, সকলের মধ্যে ত পিসিমা; তিনি কাশীতেই স্থান পেয়েচেন।

শুভদা ভাল বুঝিতে পারিল না, বলিল, কি পেয়েচেন?

পিসিমাতার কাশীতেই মৃত্যু হয়েচে।

শুভদা একথা জানিত না; তাহার এক শোকে আর এক শোক উথলিয়া উঠিল। শুভদা কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, বাবা, ললনাও নাই।

সদানন্দ বিস্মিত হইয়া কহিল, নাই? কোথায় গিয়াছে?

শুভদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, কোথায় আর যাইবে—বাছা সংসারের দুঃখেকষ্টে আত্মঘাতী হয়েচে। পাঁচদিন হল গঙ্গার তীরে তার পরনের কাপড়টি পাওয়া গেছে। শুভদা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সদানন্দও চক্ষুর জল মুছিল, কিন্তু একফোঁটা কিংবা দুইফোঁটা মাত্র। তাহার পর শুভদা যতক্ষণ না শান্ত হইলেন ততক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। শুভদা শান্ত হইলে বলিল, কিছু বলে যায়নি?

কিছু না।

হারাণকাকা কোথায় আছেন?

শুভদা চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল, বলিতে পারি না। কখন কখন বাটীতে আসেন বটে।

তিনি এখন কি করিতেছেন?

তাও জানি না।

মাধব কেমন আছে?

পূর্ব্বের মত।

আর সকলে?

ভাল আছে।

সদানন্দ উঠিতেছিল। শুভদা বলিল, তোমার ওখানে রাঁধবে কে?

আমি নিজে।

শুভদা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, এখানে খেলে হয় না?

হবে না কেন? কিন্তু তার দরকার কি, রাঁধতে আমার কোন কষ্ট হবে না।

তা হোক, তুমি এখানে খেয়ো।

সদানন্দ একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু আজ নয়। আজ পিসিমার তর্পণ করতে হবে।

শুভদা ভাবিল, তা হবেও বা, তাই কোন কথা আর বলিল না।

সদানন্দ বাটী আসিয়া একটা ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকার উপর শুইয়া পড়িল। তখন বেলা আটটা বাজিয়াছিল, পরে যখন ভূশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে—জ্যোৎস্না রাত্রি ফুটফুট করিতেছে; সদানন্দ বাহিরে আসিয়া একটা বাগান পার হইয়া শারদাচরণের বাটীর পশ্চাতে একটা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল; চাহিয়া চাহিয়া ডাকিল, শারদা !

শারদা গৃহে ছিল, সদানন্দর ডাক শুনিতে পাইল। জানালার নিকট আসিয়া বলিল, কে?

সদানন্দ বলিল, আমি।

কে—সদানন্দ?

হাঁ।

কবে এলে?

কাল রাত্রে।

এদিকে কেন? চল, বৈঠকখানায় গিয়া বসি।

না, ওদিকে যাব না, তুমি এখানেই এস।

শারদাচরণ নিকটে আসিলে সদানন্দ বলিল, ললনা মরেছে তা জান কি?

শারদাচরণ বিষণ্নভাবে কহিল, জানি।

কেন মরিল কোন সংবাদ রাখ কি?

না তবে বোধ হয় সাংসারিক দুঃখেকষ্টে আত্মঘাতী হইয়াছে।

সদানন্দ তাঁহার পানে তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখিয়া বলিল, আর কিছু জান না?

কিছু না।

সদানন্দর তীক্ষ্নদৃষ্টি তীক্ষ্নতর করিয়া বলিল, তুমি পাষণ্ড। সাংসারিক দুঃখকষ্টে একজন মরিতে পারে, আর তুমি সম্মুখে থাকিয়া একটু সাহায্য করিতে পার না?

সদানন্দর ভাবভঙ্গি দেখিয়া শারদাচরণ একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার কারণও ছিল; সে এবং সদানন্দ বাল্যসুহৃৎ, উভয়ে উভয়কে বহুদিন হইতে চিনিত। শারদার ছেলেবেলার কথা সদানন্দ সমস্ত অবগত ছিল এবং সেইজন্যই যে আজ তাহাকে কথা শুনাইতে আসিয়াছিল, সদানন্দর সে প্রকৃতি নহে; কিন্তু শারদা অন্যরূপ ভাবিয়া লইল। সে মনে করিল, সদানন্দ ছেলেবেলার সেইসব লইয়া দুটো কথা শুনাইয়া দিতেছে; তাই একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, সদানন্দ,

সে সকল কথায় এখন আর ফল কি? আরো মনে করে দেখ, আমার পিতা জীবিত রহিয়াছেন, তাঁর বর্তমানে ইচ্ছা হইলেই কি আমি যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করিতে পারি? বিশেষ সে আমাকে কিছুই বলে নাই।

সদানন্দ বিস্মিত হইল। কহিল, কিছুই বলে নাই? কিছুই বলিতে আসে নাই?

সম্প্রতি নহে; তবে অনেকদিন পূর্বে একবার আসিয়াছিল।

কি জন্য? কোথায়?

শারদাচরণ বলিল, বলিতেছি। বলিল, প্রায় মাসখানেক পূর্বে অনেক রাত্রে, আমাকে ঐ শিবমন্দিরে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল; আমার যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও গিয়াছিলাম—

সদানন্দ রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, যাইবার ইচ্ছা ছিল না?

শারদা ম্লানমুখে বলিল, আর কেন ভাই!

সদানন্দ সেকথা শুনিল না, বলিল, তারপর?

তারপর বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

কাহার সহিত?

তাহার নিজের সহিত।

নিজের? ললনার সহিত? তুমি কি বলিলে?

শারদা আপনার বাল্যকথা স্মরণ করিয়া বড় লজ্জিত হইল; কতকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, আমি—আমি—তা কি করিব বল? বাবা এখনো বাঁচিয়া আছেন।

সদানন্দ কতকটা ক্রোধে, দুঃখে, কতকটা মনের আবেগে বলিয়া ফেলিল, তোমার বাবার বাঁচিয়া কি লাভ?

এইবার শারদাচরণ কুপিত হইল। পিতার সম্বন্ধে কোন কথা তাহার সহিত না; বলিল, লাভালাভের কথা তিনি ভাল জানেন। আমাদের এবিষয়ে বিচার

করিবার কোন অধিকার নেই—ভালও দেখায় না। যা হউক, আমি বলিলাম, তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না।

সে চলিয়া গেল?

না, তখনও চলিয়া যায় নাই; ছলনাকে বিবাহ করিতে বলিল।

তুমি স্বীকার করিলে না?

শারদাচরণ সদানন্দর মুখ দেখিয়া এবং তাহার মনের কথা অনুমান করিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, অস্বীকারও করি নাই; বলিয়াছিলাম পিতার মত হইলে করিতে পারি।

সদানন্দ বলিল, পিতার মত হইল না?

না।

কেন?

বলিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বলিতেছি শুন; বাবার ইচ্ছা আমার বিবাহ দিয়া কিছু অর্থ লাভ করেন—হারাণবাবু কি তাহা দিতে পারিতেন?

সদানন্দ সে কথা শুনিয়াও যেন শুনিল না; বলিল, তোমার পিতা কি আশা করেন?

আমি বলিতে পারি না।

অর্থের আশা পূর্ণিত হইলে আর কোন আপত্তি হইতে পারে কি?

সম্ভবতঃ নহে।

তোমার নিজের কোন আপত্তি নাই?

কিছু না।

তবে দেখা যাউক, বলিয়া সদানন্দ পুনর্বার বনবাদাড় ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া চলিল।

শারদাচরণ বলিল, কোথায় যাও? একটু বসিবে না?

না।

সদানন্দ, আমার কোন দোষ নাই।

বোধ হয় নাই—ভগবান জানেন—আমি বলিতে পারি না।

রাগ করিলে?

না।

সদানন্দ বাটী ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইল, তাহার পর পুনরায় বাহির হইয়া আসিল। পথ বাহিয়া গঙ্গাপানে চলিল। ভাগীরথীর ছোট ছোট ঢেউ বাঁধাঘাটের সোপানে ঝলমল ছলছল করিয়া ঘাত-প্রতিঘাত করিয়া সরিয়া যাইতেছে আবার ফিরিয়া আসিতেছে, সদানন্দ কিছুক্ষণ সেইগুলি দেখিতে লাগিল; দূরে একখানা বজরা ছপ্‌ছপ্‌ করিয়া দাঁড় ফেলিয়া প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া আসিতেছে, সদানন্দ অন্যমনে কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ঘাটের সর্বনিম্ন সোপানের উপর বসিয়া জলে পা ডুবাইয়া আপনার মনে আকাশপানে চাহিয়া গান ধরিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেইদিন, রাত্রে জ্যোৎস্নাধৌত প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়া ভাটার স্রোতে গা ভাসাইয়া, ধীরে ধীরে হস্তসঞ্চালনের মত ছপ্‌ছপ্ করিয়া দুটি দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে সুরেন্দ্রবাবুর প্রকাণ্ড বজরা উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ভাসিয়া আসিতেছিল।

ছাদের উপরে সুরেন্দ্রবাবু ও জয়াবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, নীচে কামরার জানালা খুলিয়া মালতী গঙ্গাবক্ষে ছোট ছোট রজত ঢেউগুলি গুণিতেছিল আর চক্ষু মুছিতেছিল। মালতী বুঝিতে পারিল এইবার হলুদপুর আসিতেছে। আরো কিছুক্ষণ আসিয়া গঙ্গাতীরের অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতে পাইল। তাহার পার্শ্বে বাঁধাঘাট চন্দ্রকিরণে ধপ্‌ধপ্ করিতেছে তাহাও দেখিল। আর তাহার পশ্চাতে হলুদপুর গ্রাম সুপ্ত নিস্তব্ধ পড়িয়া আছে। মালতী তথাকার প্রত্যেক বাটী, প্রত্যেক নরনারীর নিদ্রিত মুখ মানসচক্ষে দেখিতে লাগিল, আর ঐ ঘাট—সে যখন ললনা ছিল তখন দু'বেলা ঐখানে স্নান করিতে, কাপড় কাচিতে, গাত্র ধৌত করিতে আসিত; ঐ ঘাট হইতে পিত্তলকলসী পূর্ণ করিয়া জল না লইয়া গেলে পান করা, রন্ধন করা চলিত না। মালতী এখন মালতী—সে আর ললনা নহে, তবুও তাহাকে এখনো ভুলিতে পারে নাই। শুভদাকেও ভুলিতে পারা যায় না, মাধবকেও ভুলিতে পারা যায় না, হারাণ মুখুজ্যেকে ভুলিতে পারা যায় না, তাই ভাবিতেছিল আর কাঁদিতেছিল; আর সদাপাগলাকেও সে কিছুতেই ভুলিতে পারিবে না। ইতিপূর্বেই তাহা মালতী ভাবিয়া দেখিয়াছিল। মালতী ভাবিল, ছলনা, বিন্দু, কৃষ্ণপিসীমা, গিরিজায়া, শৈলবতী, রমা—কেউ না—কেউ না; সদানন্দ তাহার পাগল ক্ষ্যাপা মুখখানা লইয়া স্মৃতির অর্ধেক জড়াইয়া বসিয়া আছে, কর্ণে তাহারই গান শুনিতে পাইতেছে। মালতীর বোধ হইল যেন সদাপাগলার প্রফুল্ল সুর করুণ

হইয়া অস্পষ্টভাবে কোথা হইতে তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতেছে। মালতী বিস্মিত হইল; স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল ঠিক সদানন্দর মত কে গীত গাহিতেছে। বজরাখানা আরও একটু আগাইয়া আসিলে মালতী দেখিল ঘাটের নীচে জলে পা রাখিয়া একজন বসিয়া আছে, কিন্তু গান তখন বন্ধ হইয়াছে।

লোকটি কে তাহা ঠিক চিনিতে না পারিলেও মালতী পরিষ্কার বুঝিল এ সদানন্দ ভিন্ন আর কেহ নহে; পাগল ক্ষ্যাপা লোক ভিন্ন কে আর অত রাত্রে মা গঙ্গাকে গান শুনাইতে আসিবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন মালতী পুনর্বার কাঁদিতে বসিল। সদানন্দর কথা যত মনে করিতে লাগিল, তত ললনার কথা মনে পড়িতে লাগিল; শুভদা, ছলনা, মাধব, পিসীমা আর হতভাগা হারাণ মুখুজ্যে—সকলেই সদানন্দর স্মৃতি মাঝখানে রাখিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনেক রাত্রে মালতী ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙ্গিল, প্রভাত হইল, ক্রমে সূর্য উঠিয়া বেলা বাড়িতে লাগিল। মালতী কিন্তু উঠিতে পারিল না। সমস্ত অঙ্গে অত্যন্ত ব্যথা; গা গরম হইয়াছে, মাথা টন্ টন্ করিতেছে, আরো নানা উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। দাসী আসিয়া গায়ে হাত দিয়া বলিল, তোমার যে দেখছি জ্বর হয়েচে। মালতী চুপ করিয়া রহিল। জয়াবতী আসিয়া গায়ে হাত দিল, জানালা খোলা আছে দেখিয়া একটু অনুযোগ করিল। বলিল, এমনি করে কি জানালায় মাথা দিয়া শুয়ে থাকে? সমস্ত রাত্রি পূবে হাওয়া লেগে গা গরম হয়েচে।

মালতী মৃদুভাবে বলিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই জানালা বন্ধ করা হয়নি।

সুরেন্দ্রবাবু একথা শুনিয়া নিজে দেখিতে আসিলেন। সত্যই জ্বর হইয়াছে। তাঁহার নিকট হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স ছিল। তাহা হইতে ঔষধ লইয়া

খাইতে দিলেন আর জয়াবতীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যেন খুব সাবধানে রাখা হয়।

জয়াবতী মালতীর কাছে আসিয়া বসিল। কামরার জানালা সার্সী সমস্ত বন্ধ, মালতী কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না, এমন কি বজরা চলিতেছে কি দাঁড়াইয়া আছে তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। কামরায় জয়াবতী ভিন্ন আর কেহ নাই দেখিয়া মালতী বলিল, দিদি! জয়াবতীকে সে দিদি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল—আমরা কতদূর এসেছি জান?

জয়াবতী বলিল, প্রায় আট-দশ ক্রোশ হবে।

মালতী তাহা জানিতে চাহে নাই, বলিল, কলকাতা আর কতদূরে?

এখনো প্রায় দু'দিনের পথ।

মালতী চুপ করিয়া একটু চিন্তা করিয়া লইল। পরে বলিল, দিদি, যদি সে সময়ের মধ্যে ভাল না হই?

জয়াবতী কথার ভাবটা বুঝিতে পারিল। স্ত্রীলোকে এ সময়ে হিংসা রাখে না—তাই একটু হাসিয়া বলিল, তাহলে আমরা তোমাকে জলে ফেলে দোব।

মালতীও একটু হাসিল, কিন্তু সে-হাসিতে এ-হাসিতে একটু প্রভেদ ছিল। বলিল, হলে ভাল হতো দিদি।

জয়াবতী অপ্রতিভ হইল। কথাটার যে আরো একটু অন্যরূপ মানে হইতে পারে তাহা সে ততটা ভাবিয়া বলে নাই, বলিল, ছিঃ! ওকথা কি বলে?

মালতী চুপ করিয়া রহিল, আর উত্তর করিল না। নিঃশব্দে সে ভাবিয়া দেখিতেছিল যে, জয়াবতীর কথা সত্য হইলে কেমন হয়? ভাল হয় কি? হয় না। মরিতে তাহার সাধ নাই। তাহাকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে, সে মরণের অধিক ক্লেশ পাইতেছে, তথাপি মরিতে পারিবে না; মরণে ভয় নাই, তথাপি মরিবার ইচ্ছা নাই। যাহারা সে ইচ্ছা করিতে পারে তাহাদের দুঃখ তত অধিক নয়। একবিন্দু জল তাহার চক্ষু দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

জয়াবতী সস্নেহে তাহা মুছাইয়া বলিল, ভাব কেন বোন? পূবে বাতাস লেগে একটু গা গরম হয়েচে, তাই বলে কি ভাবতে হয়? তাহার পর একটু থামিয়া একটু চিন্তা করিয়া সাবধান হইয়া বলিল, আর যদি তেমন তেমন হয় তা হলেও ত উপায় আছে, কাছেই কলকাতা—সেখানে ডাক্তার-বদ্দির অভাব কি?

অভাব কিছুরই ছিল না এবং প্রয়োজনও কিছুই হইল না। বজরা যেদিন কলিকাতা আসিয়া পঁহুছিল সেদিন মালতীর আর জ্বর ছিল না, কিন্তু শরীর বড় দুর্বল, এখনো কিছুই খাইতে পায় নাই। বজরা কলিকাতা ছাড়াইয়া একটু দূরে—পরপারে নোঙ্গর করা হইল। কামরার জানালা খোলা ছিল, মুখ বাড়াইয়া মালতী জাহাজ, মাস্তুল, বড় বড় নৌকা ও প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা-শ্রেণীর চূড়া দেখিতে লাগিল। মালতীর ভয় হইতেছিল; ভাবিতেছিল এই কি কলিকাতা? তাহা হইলে এত গণ্ডগোলে, এত শব্দসাড়ার মধ্যে কে তাহার কথা শুনিতে পাইবে? এত ব্যস্ত শহরে কে তাহাকে দেখিবার অবকাশ পাইবে? কিন্তু তাহা ত হইবে না, তাহাকে যাইতেই হইবে। যেজন্য এ অসমসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, যাহাদের মুখ মনে করিয়া নরকে ডুব দিতে বসিয়াছে—ইহকাল পরকাল কোন কথাই মনে স্থান দেয় নাই, তাহাদের মুখ এত শীঘ্র ভুলিতে পারিবে না। আজ না হয় কাল এ আশ্রয় পরিত্যাগ করিতেই হইবে; আর যখন হইবেই তখন আর ভয় করিয়া লাভ কি?

সে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু প্রচার করিলেন যে, বজরা এস্থানে আরও তিন-চারিদিন বাঁধা থাকিবে। মালতীর শরীর রীতিমত সুস্থ হইলে তবে সে যেখানে ইচ্ছা যাইবে; বজরাও সেইসময়ে খোলা হইবে। মালতী একথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিল। আন্তরিক সে ইহাই প্রার্থনা করিতেছিল; কেননা, যতই প্রয়োজনীয় এবং কর্তব্য হউক না, আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয়ে যাইতে মনকে তেমন সহজে রাজী করিতে পারা যায় না, ইতিপূর্বেই সে এই মর্মে তাহার সহিত কলহ করিতেছিল—এখন যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া

সেটাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া চলনসই গোছ একরকম করিয়া লইবার মত সময় পাইল।

পরদিন মধ্যাহ্নে জয়াবতী কলিকাতা ভ্রমণ করিতে যাইবে স্থির হইয়াছিল। গাড়ি, পান্‌সি ঠিক করিয়া ভৃত্য সংবাদ দিল; জয়াবতী বাবুকে তাহার সহিত যাইতে অনেক সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না! মালতী যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বাবু নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন—তাহার শরীর ভাল নয়, আবার জ্বর হইতে পারে। তখন অগত্যা জয়াবতী একাই দাসী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে গেল।

মালতী কামরার ভিতর শয়ন করিয়াছিল, সুরেন্দ্রবাবু দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মালতী সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়া বসিল, সুরেন্দ্রবাবু একটু দূরে উপবেশন করিলেন—অনেকক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল। তিনি কিছু বলিবেন মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে সাহস হইতেছিল না—অনেকক্ষণ পরে একটু থামিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, তুমি এইখানেই কি নিশ্চয় নামিয়া যাইবে?

মাথা নাড়িয়া মালতী বলিল, হাঁ।

বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি?

মালতী সেইরূপভাবে বলিল, দেখিয়াছি।

কোথায় যাইবে?

তা ত জানি না।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, তবে আর কি দেখিয়াছ? আজ নয়, কাল একবার কলিকাতার ভিতরটা দেখিয়া আসিও; তাহার পর যদি নিশ্চিত ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতই ভাল লাগে—যাইও, আমি বারণ করিব না।

মালতী কথা কহিল না।

তিনিও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া পুনরায় পূর্বাপেক্ষা ম্লানভাবে কহিতে লাগিলেন, তুমি যতটা না ভাবিয়াছ, আমি ততটা ভাবিয়া দেখিয়াছি। তুমি

ব্রাহ্মণকন্যা—হীনবৃত্তি করিতে পারিবে না; ভদ্রলোকের কন্যা ভদ্রসংসারে প্রবেশ করিতে না পারিলে তুমি থাকিতে পারিবে না; এ অবস্থায় নিঃসহায় কেমন করিয়া যে এত বড় শহরে সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারিবে, আমি বুঝিতে পারি না। কিছুক্ষণ থামিয়া আবার কহিলেন, ভাবিয়া দেখ, তোমার এ বয়সে মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া আপনাকে সামলাইয়া চলিতে পারিবে কি? ভয় হয় পাছে পদে পদে বিপদে পড়।

মালতী নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, এসকল সে সমস্তই ভাবিয়া দেখিয়াছিল, কিন্তু উপায় ছিল না, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

সুরেন্দ্রবাবু বুঝিলেন, মালতী কাঁদিতেছে, পূর্বেও তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এখন অন্যরূপ মনে হইতে লাগিল; বলিলেন, যাওয়াই কি স্থির করিলে?

মালতী চোখ মুছিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

নারায়ণপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুকে অনেকেই বোকা মনে করিত, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তাহা ছিলেন না। যাহারা তাঁহাকে এ আখ্যা প্রদান করিত তাহাদের অপেক্ষাও তিনি বোধ হয় শতগুণ অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু অনেক সময়ে তিনি দুর্বল প্রকৃতির লোকের মত কর্ম করিতেন, এইজন্য তাঁহাকে সহজে বুঝিতে পারা যাইত না। মালতীর মনের কথা তিনি ধরিয়া ফেলিলেন, মনে মনে একটু হাসিলেন, তাহার পর মালতী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে বলিলেন, মালতী, তোমার বড় টাকার প্রয়োজন, না?

তাহার চক্ষুজল আবার উছলাইয়া উঠিল। এত প্রয়োজন বোধ হয় জগতে আর কাহারো নাই।

বড় প্রয়োজন কি?

মালতী কান্না কতকটা শেষ করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, বড় প্রয়োজন।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিলেন, বুঝিতে তাঁহার আর বাকি নাই। পরের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হাসি আসিল, কারণ, এসব লোকেরও যে কাঁদিবার যথার্থ কারণ থাকিতে পারে, সকলেই যে শুধু মন ভোলাইবার জন্য কাঁদে না তাহা তিনি কুসংসর্গ-দোষে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। অল্প হাসিয়া, অল্প চাপিয়া বলিলেন, তবে আর কাঁদিতেছ কেন? তুমি রূপসী, তুমি যুবতী, কলিকাতায় যাইতেছ—এখন আর তোমাকে অর্থের ভাবনা ভাবিতে হইবে না—কলিকাতায় অর্থ ছড়ান আছে দেখিতে পাইবে।

মালতীর বোধ হইল অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে তাহার মাথাটা খসিয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে, এখন জানালা গলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। মালতী এইরূপ কিছু একটা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা বোধ হইল, যেন বাধা পড়িয়াছে, যেন মূর্ছিত হইয়া একজনের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে কোল যেন অগ্নিবিক্ষিপ্ত, বড় কঠিন, বড় উত্তপ্ত, তাহাতে যেন একবিন্দু মাংস নাই—এতটুকু কোমলতা নাই। সমস্ত পাষাণ, সমস্ত অস্থিময়। মূর্ছিত অবস্থায়ও মালতী শিহরিয়া উঠিল। যখন জ্ঞান হইল তখন যে সে কাহারো ক্রোড়ের উপর শুইয়া আছে তাহা বোধ হইল না; চক্ষু চাহিয়া দেখিল আপনার শয্যাতে শুইয়া আছে, কিন্তু পার্শ্বে সুরেন্দ্রবাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। লজ্জায় তাহার মুখ আরক্তিম হইল, দুই হাতে মুখ চাপিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শুইল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, মালতী, কাল প্রাতঃকালে আমি বজরা খুলিয়া দিব, কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া দিব না, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে। নিঃশ্বাস রোধ করিয়া মালতী শুনিতে লাগিল—যেজন্য তুমি কলিকাতা যাইতে চাহিতেছ তাহা তুমি পারিবে না। এ বৃত্তি বোধ হয় তুমি পূর্বে কখন কর নাই, এখনও পারিবে না। তোমার যত অর্থের প্রয়োজন হয়, যাহা কিছু সুখ-স্বচ্ছন্দতার অভিলাষ হয় আমি দিব।

মালতীর রুদ্ধশ্বাসের সহিত চক্ষুজল বাহির হইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রবাবু তাহা বুঝিলেন, সযত্নে আপনার ক্রোড়ের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, মালতী, আমার সহিত চল। আমি খুব ধনী না হইলেও দরিদ্র নহি—তোমার ব্যয় স্বচ্ছন্দে বহন করিতে পারিব; আর বল দেখি, আমি তোমাকে এখানে ফেলিয়া গেলে বাঁচিবে কি? না, আমিই শান্ত মনে বাটী ফিরিতে পারিব? সুরেন্দ্রবাবু তাহাকে আরো বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, সস্নেহে সে অশ্রু মুছাইলেন—আগ্রহে ছিঃ ছিঃ—লজ্জায় সঙ্কুচিত সে ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া বলিলেন, কেমন যাবে ত?

মালতীর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; সে আর সে নয়; সে ললনা নয়, সে মালতী নয়, সে কেহ নয়, শুধু এখন যাহা আছে তাহাই; সুরেন্দ্রনাথের চিরসঙ্গিনী, আজন্মের প্রণয়িনী; সে সীতা, সে সাবিত্রী, সে দময়ন্তী; সীতা-সাবিত্রীর নাম কেন; সে রাধা, চন্দ্রাবলী; কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কী? সুখ, শান্তি, স্বর্গের ক্রোড়ে আবার মান-অপমান কি?

ললনা নিস্পন্দ অচেতন স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় সুরেন্দ্রনাথের ক্রোড়ের উপর পড়িয়া রহিল; সে ক্রোড় আর অস্থিময়, পাষাণ, অঙ্গারবিক্ষিপ্ত নহে; এখন শান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল, মধুময়! ললনার বোধ হইল সে এতদিন শাপগ্রস্ত ছিল, এখন পুনরায় স্বর্গে আসিয়াছে, এতদিন পরে হৃতধন ফিরাইয়া পাইয়াছে। মালতীর সঙ্কুচিত ওষ্ঠ পুনরায় বিস্ফারিত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ সে ওষ্ঠ পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছেন, আর পাপের প্রথম সোপানে অবতরণ করিয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া ললনা দেবী স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে। তখন সূর্য অস্তগমন করিতেছিলেন, জানালার ফাঁক দিয়া এ পাপচিত্র দেখিয়া যাইলেন, সে অপরাহ্ন-সূর্য-রক্ত-করস্পর্শে ললনার মুখমণ্ডল সুরেন্দ্রের চক্ষে সহস্রগুণ অধিক মনোমুগ্ধকর প্রতিভাত হইল; তিনি সহস্র আবেগে, সহস্র তৃষ্ণায় সে-মুখ পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিলেন, মালতী, যাবে ত?

যাব।

সুরেন্দ্রনাথ উন্মত্ত হইলেন— তবে চল এখনি যাই।

কিন্তু দিদি?

কে দিদি?

তোমার স্ত্রী।

সুরেন্দ্রনাথের যেন চমক ভাঙ্গিল। শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, আমার স্ত্রী! সে ত অনেকদিন মরিয়াছে।

জয়াবতী?

সুরেন্দ্রনাথ শুষ্ক হাস্য করিলেন; বললেন, জয়া আমার স্ত্রী নয়— তাকে কখন বিবাহ করি নাই।

তবে কি?

কিছু নয়— কিছু নয়। তুমি আমার সব, সে কেহ নয়— তুমি সব— তুমি সমস্ত।

এবার মালতী তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিল, ক্রোড়ে মুখ লুকাইল,— ছিঃ ছিঃ! মুক্তকণ্ঠে কহিল, আমি তোমার চিরদাসী, আমাকে পরিত্যাগ করিও না।

না, কখন না।

তবে আমাকে নিয়ে চল।

চল।

আজি।

এখনি।

এই সময়ে বাহিরে শত-সহস্র কণ্ঠ নানাকণ্ঠে নানারূপে চিৎকার করিয়া উঠিল, ধর ধর— সরে যাও— তফাৎ— তফাৎ— গেল গেল— ডুবল— হো হো— ঐ যা— সুরেন্দ্রনাথ ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মালতীও বাহির হইয়া পড়িল; সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, এপারে ওপারে, চতুর্দিকে মাঝিমাল্লা, মুটেমজুর

সমস্ত সমবেত হইয়া চিৎকার করিতেছে এবং কিছু দূরে প্রায় মধ্যগঙ্গায় একখানা পান্‌সি স্টিমারে ধাক্কা লাগিয়া ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে।

চক্ষুর নিমিষে সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন কি ঘটিয়াছে; চিৎকার করিয়া উঠিলেন, ওতে আমার জয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলেন, কিন্তু পার্শ্ব হইতে মালতী ধরিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্রনাথ পাগলের মত ছটফট করিয়া আবার চিৎকার করিলেন, ধরো না, ধরো না— আমার জয়া যায় যে!

ততক্ষণে ক্ষুদ্রপ্রাণ নৌকাখানি প্রকাণ্ড স্টিমারের তলদেশে ধীরে ধীরে তলাইয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথও মাঝিমাল্লা, ভৃত্য প্রভৃতির হস্তে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জয়া! জ্ঞান হইলে, প্রথমে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ আকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন, জয়া! পার্শ্বে মালতী বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছিল আর চক্ষু মুছিতেছিল, তাঁহার কথার ভাবে সে আরো অধিক করিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। তিনি কিন্তু তাহা দেখিলেন না; একবারমাত্র চাহিয়া ছিলেন, তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, জয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই?

নিকটে একজন পুরাতন ভৃত্য বসিয়াছিল, সে কাতরভাবে কহিল, না।

পাওয়া যায় নাই? তবে বোধ হয় সে আর বাঁচিয়া নাই।

ভৃত্য ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বোধ হয়।

সুরেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রি কত হইয়াছে?

প্রায় দশটা।

দশটা? তবু সংবাদ নাই?

ভৃত্য উত্তর দিল, না।

সুরেন্দ্রবাবু অধিকতর হতাশ হইয়া কপালে করাঘাত করিলেন, বলিলেন, তোমরা সবাই যাও— সমস্ত শহরে সমস্ত গঙ্গার ধারে সন্ধান কর গে।

ভৃত্য মনে মনে ভাবিল, মন্দ হুকুম নয়! মুখে বলিল, যে আজ্ঞা... পরে তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া আপনার নির্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল।

কক্ষে মালতী ভিন্ন আর কেহ নাই, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। এইভাবে সময় অতিবাহিত হইয়া চলিতে লাগিল। কামরার দেয়ালে যে ঘড়িটা ছিল সেটা আপনার মনে এগারটার

পরে বারোটা, তাহার পর একটা, দুইটা, তিনটা, চারিটা— তাহার পুঁজিপাটা সমস্ত বাজাইয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহা লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া বোধ হইল না। সুরেন্দ্রনাথ এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন, মালতী পাশে বসিয়া তাঁহার যন্ত্রণা দেখিতে লাগিল, আর চক্ষু মুছিতে লাগিল; তাহারও কষ্ট হইয়াছে, লজ্জা হইয়াছে এবং ততোধিক নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সে ভাবিয়া দেখিতেছিল।

একে ত কলিকাতার গঙ্গা সমস্ত রাত্রিই প্রায় নিদ্রা যান না, এখন আবার চারিটা বাজিয়া গিয়াছে— চতুষ্পার্শ্বে অল্প ঈষৎ বেশ সাড়াশব্দ হইতেছে।

সুরেন্দ্রনাথ হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া মালতীর পানে চাহিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, সমস্ত রাত্রি মিথ্যা জাগিয়া কোন ফল নাই, তুমি শোও গে।

মালতী উঠিয়া যাইতেছিল, তিনি আবার ডাকিয়া বলিলেন, বসো, যেও না, তোমাকে কিছু বলিব।

মালতী দুইপদ অগ্রসর হইয়াছিল, পুনরায় সেইখানেই উপবেশন করিল।

সুরেন্দ্রনাথ একবার চক্ষু রগড়াইলেন, একবার কি বলিবেন তাহা যেন ভাবিয়া লইলেন, তাহার পর গম্ভীরভাবে কহিলেন, মালতী, কার পাপে এই হইল?

মালতীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; একথা সে বহুবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; উত্তরও একরকম পাইয়াছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে তাহার মুখ বন্ধ হইল, কাজেই অধোবদনে নিরুত্তর রহিল।

সুরেন্দ্রবাবুও যাহা বলিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহা না বলিয়া বলিলেন, সে সব কথা পরে হইবে, এখন যাও।

মালতী তথা হইতে আপনার কামরায় আসিয়া শয়ন করিল, কিন্তু ঘুমাইল কি? না; বাকি রাত্রিটুকু শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। অনেকবার বসিল, অনেকবার শুইল, অনেক দেবদেবীর নাম করিল, অনেক কথা মনে করিল; তাহার পর ভোরবেলায় তন্দ্রার ঝোঁকে নানাবিধ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কখন দেখিল

জয়াবতী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কখন দেখিল সদানন্দ মনের আনন্দে গান ধরিয়াছে, কখন দেখিল জননী শুভদা আকুলভাবে রোদন করিতেছে। সর্বশেষে বোধ হইল যেন মাধব আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে, কোথায় কোন্ অজ্ঞাত দেশে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতেছে, মালতীর তথায় যাইবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়িতেছে না। মালতীর সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই, কেবল প্রাতঃসূর্যকিরণ খোলা জানালার ভিতর দিয়া তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মালতী শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

সেদিন সমস্তদিন সে সুরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইল না; কিছু পূর্বেই তিনি বজরা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পরদিনও তিনি আসিলেন না; তাহার পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া আপনার কামরায় প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সেদিনও এমনি কাটিল। পরদিন তিনি মালতীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

মালতী কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিম্নমুখে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু একখানা কাগজ লইয়া কি লিখিতেছিলেন, বোধ হয় কোথাও পত্র লিখিতে ছিলেন। মালতী আড়চক্ষে ভয়ে ভয়ে দেখিল তাঁহার সমস্ত মুখ অতিশয় ম্লান, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া আছে, মাথার চুলগুলা নিতান্ত রুক্ষভাবে দাঁড়াইয়া আছে, বস্ত্রের স্থানে স্থানে এখনো কাদা লাগিয়া আছে, মালতী আপনা-আপনি শিহরিয়া উঠিল, তাহার বোধ হইল যেন নিতান্ত গর্হিত অপরাধে তাহাকে বিচারালয়ে আনয়ন করা হইয়াছে।

সুরেন্দ্রবাবু অর্ধলিখিত কাগজখানা পার্শ্বে রাখিয়া মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, তোমার শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছে কি?

মালতী অধোবদনে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হইয়াছে।

আমি আজি বজরা খুলিয়া দিব। পরপারে কলিকাতা— তোমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার।

কথা শুনিয়া মালতীর চক্ষে জল আসিল, কোন কথা সে কহিল না।

সুরেন্দ্রবাবু পার্শ্বের কাগজখানা হাতে লইয়া বলিলেন, এখানে আমার একজন বন্ধু আছেন, এই পত্রখানা লইয়া সন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট যাইও, তিনি তোমার কোনরূপ উপায় করিয়া দিবেন।

টপ্ করিয়া একফোঁটা জল মালতীর চক্ষু হইতে পদতলে কার্পেটের উপর পড়িল।

সুরেন্দ্রবাবুও বোধ হয় তাহা দেখিতে পাইলেন। একটু থামিয়া বলিলেন, তোমার নিকট টাকাকড়ি বোধহয় কিছুই নাই?

মালতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তাহা আমি জানিতাম। এই নাও, বলিয়া একটা মনিব্যাগ উপাধানের নিম্ন হইতে বাহির করিয়া তাহার পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ইহাতে যাহা আছে, কোনরূপ উপায় না হইলেও এক বৎসর ইহা হইতে তোমার স্বচ্ছন্দে চলিবে; তাহার পর ঈশ্বরের আশীর্বাদে যাহা হয় করিও।

আর একফোঁটা জল কার্পেটের উপর আসিয়া পড়িল।

সেদিন উন্মত্ত ছিলাম, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কাহার পাপে এমন ঘটিল? কিন্তু এখন জ্ঞান হইয়াছে, এখন দেখিতেছি আমারই পাপের এই ফল— তুমি নির্দোষ! আমার জয়াকে আমিই মারিয়া ফেলিয়াছি।

কপালের উপর কয়েক বিন্দু ঘাম জমা হইতেছিল, তিনি হাত দিয়া হাত মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ঢের হইয়াছে— আর পাপ করিব না; কিছুদিন সৎপথে থাকিয়া দেখি যদি সুখ পাই।

মালতী দাঁড়াইয়া রহিল; সুরেন্দ্রবাবু পত্রখানা শেষ করিতে লাগিলেন। শেষ হইলে, মুড়িয়া খামে পুরিয়া শিরোনামা দিয়া তাহার পায়ের নিকট ফেলিয়া

দিয়া বলিলেন, এই নাও। শ্যামবাজারে সন্ধান করিয়া লইও, বোধ হয় ইহাতে উপকার হইবে।

কম্পিতহস্তে মালতী পত্রখানা তুলিয়া লইল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, টাকা নাও।

সে তাহাও উঠাইল; দ্বারের দিকে একপদ অগ্রসর হইল।

সুরেন্দ্রবাবুর ভিতরটা কি একরকম করিয়া উঠিল; বলিলেন, ধর্মপথে থাকিও—

মালতী আর একপদ অগ্রসর হইল। এবার সুরেন্দ্রনাথের গলা কাঁপিল— মালতী, সেদিনকার কথা বিস্মৃত হইও—

মালতী দ্বারের হাতল ধরিয়া টানিল, দ্বার অর্ধউন্মোচিত হইল, সুরেন্দ্রনাথের গলা আরো কম্পিত হইল— অসময়ে, কষ্টে পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও।

মালতী বাহিরে আসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষুও জলে ভরিয়া গেল; ডাকিলেন, মালতী !

মালতী সেইখানেই দাঁড়াইল।

আবার ডাকিলেন, মালতী!

সে এবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া কপাটে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

চক্ষু মুছিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, জয়ার শোক এখনও ভুলি নাই—

মালতী দ্বার ছাড়িয়া সেইখানে উপবেশন করিল, তাহার পা কাঁপিতেছিল।

মালতী, কি লইয়া সংসারে থাকিব? সুরেন্দ্রনাথ বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন—তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে আর বাঁচিব না। এইবার নীচে গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

মালতী কাছে আসিয়া বসিল, আপনার ক্রোড়ের উপর মাথা তুলিয়া লইয়া চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, আমি যাইব না।

তখন দুইজনেই বহুক্ষণ ধরিয়া রোদন করিলেন। মালতী পুনর্বার চক্ষু মুছাইয়া দিল। সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু মুদ্রিতই ছিল; সেইভাবেই ভগ্নস্বরে বলিলেন, সেদিন তুমি কি বলিয়াছিলে মনে আছে?

কি?

চিরদাসী।

তাই।

সুরেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, হরিচরণ!

ছাদের উপর হইতে হরিচরণ মাঝি বলিল, আজ্ঞে।

বজরা এখনি খুলিয়া দাও।

এখনি?

এখনি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যতক্ষণ বজরাখানা দেখা গেল, সদানন্দ গীত বন্ধ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বাটীতে আসিয়া শয়ন করিল। আজ তাহার মনটা ভাল ছিল না, নিদ্রাও ভাল হইল না। প্রাতঃকালে শুভদার নিকট আসিয়া বলিল, আমার এখানে খেলে হয় না?

শুভদা শুষ্কমুখে বলিল, কেন হবে না?

আমি তাই মনে করছি; আমার কেউ নেই, দু'বেলা এখানেই দুটি খাব।

শুভদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বেশ ত।

পিসিমার শ্বশুরবাড়িতে তাঁর কতক জমিজমা আছে, সেগুলা আমিই পাইয়াছি, দু-একদিনের মধ্যেই সেখানে যাইয়া আমাকে সব দেখিয়া-শুনিয়া লইতে হইবে।

শুভদা বলিল, তা ত নিশ্চয়, না হলে কে আর দেখিবে?

তাই মনে করিতেছি যে, আমার ধানের গোলাটা এখানেই রাখিব, না হইলে চুরি যাইতে পারে।

শুভদা ভিতরের কথা বুঝিল না। বলিল, এতদিন ত চুরি যায়নি।

না যাউক, কিন্তু এখন ত যাইতে পারে?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

ইহার দুই-একদিনের মধ্যেই সদানন্দর ধানের গোলা, কলাইয়ের মরাই, আলুর বোঝা, নারিকেলের ডাঁই, গুড়ের জালা সমস্ত একে একে সরিয়া আসিয়া মুখুজ্যে-পরিবারে স্থান গ্রহণ করিল।

দেখিয়া-শুনিয়া শুভদা বলিল, সদানন্দ, লোকে কি বলিবে?

সদানন্দ হাসিয়া উত্তর দিল, জিনিস আমার, লোকের নহে। আমি এইখানে খাই, এইখানে থাকি, আমার জিনিসপত্রও এইখানে থাকিবে।

বাস্তবিক পাড়ার পাঁচজনও পাঁচরকম কথা কহিতে লাগিল; কেহ বলিল, হারাণের বৌ সদাপাগলাকে জাদু করিয়াছে; কেহ কহিল, সদানন্দ একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে; কেহ বা এমন কথাও রটাইল যে, ছলনার সহিত সদার বিবাহ হইতেছে। সদানন্দ একথা শুনিয়া মনে মনে হাসিল; যে সম্মুখে একথা উত্থাপন করিল তাহাকে হাসিমুখে একটা রামপ্রসাদী গান শুনাইয়া দিল, কাহাকে বা রসিকতা করিয়া বলিল, আমি মরিলে তোমার নামে দুবিঘা জমি লিখিয়া দিয়া যাইব, কাহাকে বা ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিল, পাগলা মানুষে পাগলামি করে সেজন্য তোমরা ভাবিও না। ক্রমশঃ লোকে মুখ বন্ধ করিতে লাগিল, তবে যাহারা ঈর্ষাপরতন্ত্র তাহারা মনে মনে জ্বলিতে লাগিল। ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একথা শুনিয়া সদানন্দকে ডাকিয়া বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়া দিলেন।

বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়া সদানন্দ দুঃখিতভাবে বলিল, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; এখন পিসিমার শ্বশুরবাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া ধানের গোলাটা আপনার বাটীতে রাখিয়া যাইব।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ওহে সদানন্দ, তোমার পিতাও আমাকে মান্য করিয়া চলিতেন।

আমিও কোনরূপ অমান্য করি নাই।

তবে এমন কথা বলিলে কেন?

সদানন্দ অপ্রতিভভাবে কহিল, আমার সব সময়ে মতিস্থির থাকে না।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আরো রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, তুমি উৎসন্ন যাইতেছ।

সদানন্দ মৃদু হাসিল; আপনারা একটু চেষ্টা করিলে না যাইতেও পারিতাম।

তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।

যে আজ্ঞা, বলিয়া সদানন্দ বাহিরে আসিয়া খুব একগাল হাসিয়া লইল, তাহার পর গলা ছাড়িয়া রামপ্রসাদী ধরিল।

নিকটে কাঙ্গালীচরণ মাথায় পটলের বোঝা লইয়া হাটে যাইতেছিল, সে চোখে হাসি, মুখে গান দেখিয়া বলিল, কি দাদাঠাকুর, এত আমোদ কিসের?

সদানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ ছিল, খুব খেয়েছি।

সে বলিল, বটে!

তখন সদানন্দ আজকাল পটলের দর জিজ্ঞাসা করিয়া আর একবার হাসিয়া পূর্বত্যক্ত গানটার সুর গলার মধ্যে বেশ করিয়া ভাঁজিয়া লইয়া মনের আনন্দে পথ বাহিয়া চলিল, কাঙ্গালীচরণও যথাস্থানে চলিয়া গেল।

এখন একটা কথা আছে। কবি বলিয়াছেন, মনেই স্বর্গ, মনেই নরক; সাংসারিক অস্তিত্ব ইহার বড় একটা নাই। একথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও যে আংশিক সত্য, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কারণ, হারাণচন্দ্রের যাহা পার্থিব সুখের শেষ সীমা, শুভদা তাহা তেমন উপভোগ করিয়া উঠিতে পারে না। হারাণচন্দ্র দুবেলা পরিতোষে আহার করিতে পান, চাহিলেই দুই-চারি আনা পয়সা স্ত্রীর নিকট কর্জ পাইতে পারেন, তাহা পরিশোধ করিবার বালাই মাত্র নাই, বাজারের ভিতর দিয়া এখন উন্নত মস্তকে গমনাগমন করেন, কোন শ্যালকের নিকট একটি পয়সা মাত্র কর্জ নাই, আড্ডাধারী তাঁহার পূর্বপদ সসম্মানে ফিরাইয়া দিয়াছে; আর চাই কি? তবে যেটুকু বাকি আছে, হারাণচন্দ্র ভাবেন, সদানন্দ আর একটু ক্ষেপিলেই তাহা সমাধান করিয়া ফেলিবেন।

গুলির দোকানটা তখন নিজেই কিনিয়া লইবেন, আর কাত্যায়নী ছোটলোক বেটীর গর্ব রীতিমত খর্ব করিবেন। তাহার এক বৎসরের খোরাক ঝনাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে আগাম ফেলিয়া দিয়া বলিবেন, ছোটলোক বেটী!

আমাকে হেয় করিস? পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতারা জানেন না, তা তুই কোন্ ছার। আর ভগবান নন্দী তার বাটীর সম্মুখে যদি আড্ডাঘর না বসাই ত আমার নাম হারাণ নয়। হারাণচন্দ্র এখন গুনগুন্ স্বরে গলায় সুর লইয়া সমস্ত বামুনপাড়াটা ঘুরিয়া বেড়ান।

কিন্তু শুভদা? তাহার কি এক ভাবনা? ভগবান জানেন স্বামীসুখ সে একদিনের জন্যেও পায় নাই; অন্ততঃ তাহার মনে পড়ে না— সে স্বামীর মুখে অন্নব্যঞ্জন তুলিয়া দিতে যে তাহার কত আনন্দ, কত তৃপ্তি, তাহা সে নিজেই অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারে না; আনন্দে চোখের কোণে জল আইসে, কিন্তু কে তাহা দেখিবে? দেখিবার একজন ছিল, বুঝিবার একজন ছিল, কিন্তু সে পূর্বেই গত হইয়াছে।শুধু ইহাই যদি হইত, তাহা হইলে শুভদা এই সুখেই সাংসারিক কাহিনী খতম করিয়া দিতে পারিত; কিন্তু ছলনা দিন দিন বড় হইয়া উঠিতেছে, তাহার উপায় কি করিয়া হইবে? যে মরিয়াছে সে বাঁচিয়াছে, কিন্তু মাধবের মনে যে কি আছে, শুভদা সে তত্ত্ব কিছুতেই নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারে না। আজকাল চিকিৎসার অনেক সুযোগ হইয়াছে, যথাসাধ্য চিকিৎসাও হইতেছে, কিন্তু ফল যে কিছু হইতেছে তাহা কিছুতেই বোধ হয় না। শুভদা একথা ভাবিয়া কপালে করাঘাত করে, ললনার কথা মনে করিয়া আকুলভাবে আপনা-আপনি রোদন করে, আর তাহার নিকট যাইবার কামনা করে; আবার জল আনে, রন্ধন করে, সকলকে খাওয়ায় পরায়— এমনি করিয়া দিন অতিবাহিত করিয়া চলিতেছে।

একদিন মধ্যাহ্নে আহার করিতে বসিয়া সদানন্দ শুভদার মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল, ছলনা বড় হয়েছে।

শুভদা মলিন মুখে বলিল, হাঁ।

আর রাখা যায় না, ভালও দেখায় না।

শুভদা বলিল, মা দুর্গাই জানেন।

সদানন্দ একটু হাসিল; বলিল, মা দুর্গা ত আর বিবাহ দিয়া যাইবেন না?

শুভদা মৌন হইয়া রহিল।

হরমোহনবাবুর ছেলে শারদার সহিত বিবাহ দিলে হয় না।

শুভদা ভাল বুঝিতে পারিল না; বলিল, শারদার সঙ্গে?

হাঁ।

তা সম্ভব কি?

অসম্ভবই বা কিসে?

কি জানি! একথাটা শুভদা সম্পূর্ণ হতাশভাবেই বলিল।

পাগলা সদানন্দ তাহা বুঝিতে পারিয়া লুকাইয়া একটু হাসিয়া লইল; তাহার পর বলিল, এ বিষয় শারদার নিকট একদিন বলিয়াছিলাম; তাহার অমত নাই।

শুভদার মুখে আগ্রহের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, কিন্তু তখনই তাহা মিলাইয়া গেল; বলিল, কিন্তু তার পিতা? তাঁর কি মত হইবে?

না হইবে কেন?

কেন হইবে না, তাহা শুভদা বুঝিত, ছেলের ইচ্ছাসত্ত্বেও কেন যে বাপের ইচ্ছা হইবে না তাহাও জানিত, কিন্তু খুলিয়া বলিতে পারিত না। তাহার একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, কে তাহার পিতার মত করিতে যাইবে? কিন্তু তাহাও বলিল না, শুধু মৌনমুখে কাতর নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

পাগলা সে মৌনভাষাও বুঝিল; বলিল, তাহার পিতার মত আমাদেরই চেষ্টা করিয়া করিতে হইবে। কারণ বিবাহ ত দিতেই হইবে।

শুভদা ভয়ে ভয়ে, আশায় নিরাশায়, অস্ফুটে বলিল, হইবে কি?

নিশ্চয় হইবে।

কেমন করিয়া জানিলে?

পাগলা আবার একটু হাসিল; আমি তাহা জানি। আপনি ভাবিবেন না, এ মত আমি নিশ্চয় করিব।

বৃদ্ধ হরমোহনের কিরূপে মত করিতে হইবে সদানন্দ তাহা বিশেষ বিদিত ছিল, মত যে নিশ্চয় হইবে তাহাও জানিত।

শুভদা কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া ঘরের ভিতর হইতে দুধ আনিতে গেল। কিন্তু দুধের বাটি হাতে লইয়া অসাবধানে তাহাতে বড় একফোঁটা চোখের জল মিলাইয়া ফেলিল। অপ্রতিভভাবে বাহিরে আসিয়া কহিল, সদানন্দ, বসো, ওঘর থেকে দুধটা বদলে নিয়ে আসি।

ওঘরে আসিয়া, দুগ্ধের কড়ায় হাত রাখিয়া শুভদা আরো একটু কাঁদিয়া লইল, সাবধান হইয়া আরো দুই-চারিটা বড় বড় ফোঁটা মৃত্তিকার উপরে ফেলিল, তাহার পর চক্ষু মুছিয়া দুগ্ধ ঢালিতে লাগিল। শুভদা কাঁদিল বটে, কিন্তু তাহা অন্তর্ভেদী রক্তবিন্দু নহে; বরং অসম্ভব আনন্দাশ্রু; ললনার শোকের একফোঁটা জল; স্বামীর বেদনার একবিন্দু বারি।

আহার সমাপন করিয়া সদানন্দ মাঠপানে চলিল। সেখানে তাহার ক্ষেত আছে, কৃষাণ কাজ করে, গরুবাছুর চরিয়া বেড়ায়— সেখানে সদানন্দ আলের উপর কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল, একটা অশ্বত্থমূলে বসিয়া দুই-চারিটা কালীনাম করিল, দুই-চারি ছিলিম তামাকু পোড়াইল, তাহার পর তথা হইতে উঠিয়া হরমোহনবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধ হরমোহন তখন নিদ্রান্তে তাম্বুল চর্বণ করিতেছিলেন, কলিকার তাওয়াটা তখনও তত উত্তপ্ত হয় নাই, একটু একটু ধূম নির্গত হইতেছিল মাত্র।

বৃদ্ধ, সদানন্দকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি হে, অনেকদিন যে তোমাকে দেখি নাই?

সদানন্দ বলিল, অনেকদিন কাশীতে ছিলাম।

তাহা শুনিয়াছিলাম। তোমার পিসিমাতার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে তাহাও শুনিয়াছি। আসিলে কবে? বসো।

সদানন্দ বিলক্ষণ সপ্রতিভভাবে নিকটেই স্থান গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিল। সদানন্দ মুখবন্ধের ধার ধারে না, মিথ্যা আড়ম্বরের ঘটা তাহার ভাল লাগে না; বসিয়াই বলিল, মহাশয়ের নিকট বিবাহের ঘটক হইয়া আসিয়াছি।

হরমোহন হাসিয়া বলিলেন, কাহার?

আপনার পুত্রের।

বৃদ্ধ এইবার গম্ভীর হইলেন। বিষয়ী লোক সাংসারিক কথাবার্তার সময় হাসিতামাশাগুলিকে অনেকদূরে বিদায় দিয়া আইসেন। হরমোহনের নিকট তাঁহার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্তা একটা গুরুতর বৈষয়িক আলোচনার মধ্যে। এতাবৎ এবিষয়ে তাঁহাকে অনেক মাথা ঘামাইয়া আসিতে হইয়াছে, অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইয়াছে। তাঁহার মতে এরূপ জটিল দেনা-পাওনার যুক্তিতর্কে রীতিমত বুদ্ধি পরিচালনা না করিতে পারিলে কিছুতেই একটা ন্যায্য মীমাংসায় আসিতে পারা যায় না, এবং পলিতমুণ্ড, মুণ্ডিতশ্মশ্রু ব্যক্তি ভিন্ন যে ঘটকালির কথা অপর কাহারও মুখেও আসিতে পারে তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। এখন উক্তরূপ গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা একজন বালকের মুখে শুনিয়া বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিছু দিবস পূর্ব হইতে তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন যে, সদানন্দ আরো একটু অধিক বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াছে, এবং এখন তাহার ক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়া বিলক্ষণ রুক্ষভাবে এবং যথারীতি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, কাহার বিবাহ?

শারদার?

আজ্ঞা হাঁ।

বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে বাটীর ভিতরপানে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক কহিলেন, ঐদিকে বোধ হয় শারদা আছে, যাও।

তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া একথার অর্থ সদানন্দ বুঝিল। একটু হাসিয়া বলিল, শারদার সহিত আমার প্রয়োজন নাই, আপনার নিকটেই আসিয়াছি।

বৃদ্ধ পূর্বোক্ত প্রকারেই জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার নিকট?

আজ্ঞা হাঁ।

কেন?

এই যে বলিলাম—আপনার পুত্রের সম্বন্ধ করিতে। শারদার কি বিবাহ দিবেন না?

দিব—কিন্তু সে কথা কেন?

প্রয়োজন না থাকিলেই কি আসিয়াছি?

তোমার প্রয়োজন? আমার সহিত?

আজ্ঞা হাঁ।

কিন্তু তোমার সহিত সেসব কথা হইতে পারে না।

সদানন্দ বুঝিল যে, জগতের এ শ্রেণীর লোকের নিকট, মুখে একবিন্দু হাসির চিহ্নমাত্র থাকিলেও সাংসারিক কোনরূপ কথাবার্তা চলিতে পারে না; মুখখানা তোলোহাঁড়ির মত না করিতে পারিলে, সে যে দেনাপাওনা, টাকাকড়ির কথা একবিন্দুও বুঝিতে পারে তাহা এ সম্প্রদায়ের মনুষ্য ধারণার মধ্যেই আনিতে পারে না। তখন সদানন্দ চেষ্টা করিয়া যতখানি পারিল ততখানি গম্ভীর হইয়া বলিল, খুব হইতে পারে। বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের স্বর্গলাভ হইয়াছে; সেই অবধি আমিই তাঁহার সমস্ত বিষয়-আশয় দেখিয়া আসিতেছি। সাংসারিক কথাবার্তা আমাদিগকেও কহিতে হয়; বিবাহের সম্বন্ধ করিতে আসিয়া দেনাপাওনা মীমাংসা করিতে হয় তাহা অবগত আছি এবং আশা করি সে বিষয়ে আপনিও যতটা বুঝিবেন, আমিও প্রায় ততটাই বুঝিব।

বৃদ্ধ হরমোহনের এই প্রথম বোধ হইল যে, ইহা ঠিক পাগলের মত বলা হয় নাই। একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অবশ্য দেনাপাওনার মীমাংসা ত একটা করাই চাই।

সদানন্দ হাসি চাপিতে পারে না; তাই আবার একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, পূর্বেই মহাশয়কে নিবেদন করিয়াছি যে, সে সব আমার সহিত হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না; তাহার কোনরূপ একটা মীমাংসা করিতে আসিয়াছি।

হরমোহন একটু নরম হইলেন। বলিলেন, কাহার কন্যা? কোথায়?

এই গ্রামেই। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা।

হারাণের?

আজ্ঞা হাঁ।

সে কি দিবে?

আপনি যাহা চাহিবেন তাহাই।

বৃদ্ধ একটু চিন্তা করিয়া লইলেন ; তাহার পর বলিলেন, মেয়েটি দেখিতে শুনিতে কেমন?

আপনি তাহাকে দেখিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় আপনার স্মরণ নাই; যাহা হউক, মেয়েটি দেখিতে শুনিতে আমার বিবেচনায় মন্দ নয়। আপনার পুত্র তাহাকে দেখিয়াছে—বিবাহ করিতেও অনিচ্ছুক নহে।

বৃদ্ধ এবার একটু হাসিল। বলিল, তা হইলেই হইল। আর আমাদের গৃহস্থ পরিবারে মোমের পুতুলেরও বিশেষ প্রয়োজন নাই; দেখিতে শুনিতে নিতান্ত মন্দ না হয় এবং কাজকর্ম করিতে পারে, এই হইলেই হইল।

সদানন্দ বলিল, তা পারিবে।

কিন্তু হারাণ কি দিতে পারিবে? তার অবস্থা ত এখন ভাল নয়।

না, অবস্থা ভাল নয়। তাই বুঝে আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই দিবেন।

বৃদ্ধ একটু মুস্কিলে পড়িলেন। মনে মনে ভাবিলেন, উপরোক্ত কথাটা না বলিলেই ভাল করিতেন। কিন্তু বিষয়-বুদ্ধিশালী হরমোহন তাহা সহজেই শোধরাইয়া লইয়া বলিলেন, তা কি জানি বাপু, মেয়ের বিবাহের কিছু খরচ আছেই।

অবশ্য।

তখন হরমোহন অভ্যাসমত অধরের ক্ষীণহাসিটুকু বিদায় দিয়া পাথরের মানুষটি সাজিয়া বলিলেন, এক সহস্র নগদ মুদ্রার কম শারদার বিবাহ আমি কিছুতেই দিতে পারি না।

সদানন্দ সহাস্যে বলিল, তাহাই হইবে।

সদানন্দর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ত নিজের উপরই চটিয়া গেলেন। আপনাকে একটি অতিশয় বৃহদাকার গর্দভ বলিয়া মনে মনে সম্বোধন করিলেন; কেন দেড় সহস্রের কথা কহিলেন না, এ আপসোস তাঁহার হৃদয় ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। যখন কথা বাহির হইয়া গিয়াছে তখন আর ফিরাইতে পারা যায় না; যাহা হউক, মন্দের যতটা ভাল হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে বলিলেন, অবশ্য মেয়েকে গহনা দিতেই হবে।

হবেই।

দান-সামগ্রী রীতিমত আছেই।

আছেই।

তবে আমারও অমত নাই।

তবে একটা দিন স্থির করিয়া ফেলুন।

বৃদ্‌ধ একটু ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, অবশ্য এ বিবাহ আপনা-আপনির মধ্যেই, আর হারাণও কিছু আমাদের পর নয়, তবুও নিয়মগুলা সব পালন করিয়া চলিতে হইবে।

সদানন্দ একটু শঙ্কিত হইয়া বলিল, নিয়ম আবার কি?

সহাস্যে—নিয়ম এমন কিছুই নয়, তবে লেখাপড়া একটা প্রয়োজন।

বেশ তাহাই হউক।

কিন্তু কাহার সহিত হইবে?

আমারই সহিত হউক।

কবে?

সদানন্দ একটু ভাবিয়া বলিল, এক মাস পরে।

বৃদ্ধ সম্মত হইলেন।

তখন সদানন্দ বলিল, আমার একটি অনুরোধ আছে।

কি বাপু?

এ দেনাপাওনার কথা যেন তৃতীয় ব্যক্তি না শুনিতে পায়।

কেন?

একটু কারণ আছে।

হরমোহন বৈষয়িক লোক; সদানন্দর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, নিঃশব্দে দান করিতে চাও?

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া, সে নিঃস্বার্থ দয়া দেখিয়া হরমোহনেরও সেইসময়ের জন্য লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি রীতিমত বৈষয়িক লোক, এভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে দিলেন না। একটা শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, বাপু, আমাদের বয়েস হইয়াছে, এইজন্য চক্ষুলজ্জাও ততটা নাই, না হইলে হারাণের অবস্থা আমি বিশেষরূপেই জানি। যাহা হউক, তুমি যখন নিঃশব্দে দান করিতে পারিতেছ, তখন আমিও নিঃশব্দে গ্রহণ করিতে পারিব। সেজন্য তুমি চিন্তা করিও না।

সদানন্দ প্রফুল্লমুখে নমস্কার করতঃ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শুভদা শুনিলেন, হারাণবাবু শুনিলেন, ছলনাও শুনিল যে, তাহার সহিত শারদার বিবাহ হইতেছে। এ বিবাহ সদানন্দ ঘটাইয়াছে। শুনিয়া রাসমণি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, সদানন্দ পূর্বজন্মে শুভদার পুত্র ছিল। সদানন্দর সমক্ষে একথা বলা হইয়াছিল, সে একথা নিরুত্তরে স্বীকার করিয়া লইল, অতঃপর কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না।

নানা গোলযোগে পড়িয়া তাহার এ পর্যন্ত পিসিমার সম্পত্তি দেখিতে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, এখন সময় পাইয়া একথা সে শুভদাকে জ্ঞাত করিল, শুভদা তাহাতে সম্মত হইল; তখন পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া কিছু দিবসের জন্য শ্রীমাণ সদানন্দ বিদেশযাত্রা করিল। শুভদার সংসার এখন তাহার সংসার হইয়াছে; সুতরাং ইহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে ভুলিল না এবং আরো, বিবাহের অপরাপর সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্য শুভদাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল। সেখানে যাইয়া সদানন্দ মৃত পিসিমাতার সমস্ত জমিজমা বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া লইল, তাহার পর একজন মুরুব্বি স্থির করিয়া এককথায় তাহাকে সমস্ত বিক্রয় করিয়া অর্ধমাস-কালের মধ্যেই হলুদপুরে পুনরায় ফিরিয়া আসিল। হরমোহনের সহিত লেখাপড়া করিল, গহনা গড়াইল, জিনিসপত্র আনাইল, বিবাহের দিন স্থির করিল, তাহার পর সময় করিয়া শারদাচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিল। এতদিন পর্যন্ত নিভৃতে তাহার সহিত দুটো কথা কহিবার সময় হইয়া উঠে নাই। আজ অনেকদিনের পরে দুজনেই আপসে দুটো কথা কহিতে চাহিল, তাই হাত ধরাধরি করিয়া গঙ্গাতীরে একস্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

উপবিষ্ট হইয়া শারদাচরণ বলিল, সদানন্দ, তোমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে?

স। কতক কতক মনে পড়ে বৈ কি।

শা। মনে পড়ে যখন আমি একজনকে বড় ভালবাসতাম, যখন দিবারাত্রি কেবল ঐ কথাই ভাবিতাম, তোমার কাছে কত আশা, কত কল্পনা, কত কি বলিতাম, অভিমান হইলে কত কাঁদিতাম, আর তুমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে—নাহয় বিদ্রূপ করিতে, সেসব কথা তোমার মনে পড়ে সদানন্দ?

স। তা আর পড়ে না? সে ত সেদিনকার কথা; বোধ হয় সাত-আট বৎসরের অধিক হইবে না—কিন্তু বিদ্রূপ ত কখন করি নাই।

শা। আমার বোধ হইত যেন বিদ্রূপ করিতে। যা হোক, তাহার পর যেদিন সে আমার সব আশা ধূলিসাৎ করিয়া দিল, অভিমানভরে দুজনেই কথা বন্ধ করিয়া চিরবিদায় লইলাম; সেদিন কত রাত্রি পর্যন্ত তোমার কাছে বসিয়া কাঁদিলাম, সেকথা তোমার মনে আছে ভাই?

স। আছে।

সদানন্দ কিছু অন্যমনস্ক হইল। শারদা কিন্তু তাহা লক্ষ্য না করিয়া অদূরে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কহিল, ঐখানে সে মরিয়াছে!

সদানন্দ সেকথা যেন শুনিতে পাইল না, আপনমনে গঙ্গায় একখানা নৌকা সাদা পালভরে উড়িয়া যাইতেছিল, তাহার পানে চাহিয়া রহিল। শারদা আবার বলিল, ঐখানে ললনা ডুবিয়া মরিয়াছে।

এবার সদানন্দ মুখ ফিরাইয়া বলিল, কোন্‌খানে?

শা। ঐখানে।

স। কেমন করে জানিলে?

শা। ঐখানে তার পরিহিত বস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল।

সদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল তবে, কাপড়খানা একবার দেখিয়া আসি।

শারদা অল্প হাসিল; কাপড়খানা কি এখনো ঐখানে আছে?

স। চল তবে স্থানটা দেখিয়া আসি।

দুজনে তখন সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। সদানন্দ জল লইয়া চোখমুখ ধুইল, তাহার পর পুনর্বার যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

শা। সদানন্দ, আমার বড় অনুতাপ হয়।

স। কেন?

শা। সময়ে সময়ে বোধ হয় আমিই তাকে মারিয়া ফেলিয়াছি।

স। কেন?

শা। জগদীশ্বর জানেন তার আয়ু শেষ হইয়াছিল কি না, কিন্তু আমার বোধ হয় আমি বিবাহ করিলে সে হয়ত এখনও বাঁচিয়া থাকিত।

সদানন্দ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল, যে মরিয়াছে সে নিশ্চয়ই মরিত! তুমি কি করিবে?

শা। তাহা জানি। তবুও যদি তাহার কথা রাখিতাম, যদি বিবাহ করিতাম!

সদানন্দ হাসিল; জাত যাইত যে।

শারদাচরণ তাহা ভাবিল; বলিল, তাহা যাইত।

তবে আর তুমি কি করিবে?

শারদার চোখে জল আসিল। আর কি করিব, কিন্তু এত অনুতাপ হইত না!

সদানন্দ অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, ক্রমশঃ চলিয়া যাইবে।

শা। আহা, যদি তাহার শেষ অনুরোধটাও রক্ষা করিতে পারিতাম!

স। কি অনুরোধ?

শা। বলিয়াছিল, একঘর দরিদ্রের জাতি বাঁচাও—ছলনাকে বিবাহ কর।

সদানন্দ তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, ছলনাকে কি বিবাহ করিবে না?

শা। করিব, কিন্তু তার অনুরোধ রক্ষা করা হইল কি?

স। কেন হইল না?

শা। প্রকারান্তরে হইল বটে, কিন্তু—আচ্ছা সদানন্দ, বাবাকে তুমি কি করিয়া সম্মত করিলে?

সদানন্দ মৃদু হাসিল; বললাম, যে তোমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে।

শা। শুধু এই?

স। আবার কি?

শা। আমি কি বাবাকে চিনি না?

সদানন্দ আবার হাসিল; বলিল, তবে জিজ্ঞাসা কর কেন?

শা। জিজ্ঞাসা করিতেছি যে কত টাকা দিতে হইবে?

স। সেকথা শুনিয়া তোমার লাভ নাই।

শা। সদানন্দ, এ যে পাপের ধন!

স। আমি আশীর্বাদ করিব যেন তোমার জীবন চিরসুখে কাটে।

শা। সময় হইলে আমি ফিরাইয়া দিব।

স। দিও। বলিয়া সদানন্দ উঠিয়া আসিয়া যেস্থানে ললনার বস্ত্র পড়িয়াছিল সেস্থানের মাটি তুলিতে লাগিল।

শারদা বিস্মিত হইয়া বলিল, ও কি কর! সন্ধ্যাবেলা মাটি তোল কেন?

সদানন্দ খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, পাগলামি করিতেছি।

বাস্তবিক বলিতে কি, শারদাচরণ তাহার কথার সহিত কাজের বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাইল না; তথাপি বলিল, পাগলামি করিতেছ তাহা ত বলি নাই।

স। তুমি বলিবে কেন, আমি বলিতেছি।

শা। না না, সত্য বল মাটি লইয়া কি করিবে?

স। আমি আজকাল শিবপূজা করি; বাটীতে গঙ্গামাটি নাই তাই লইয়া যাইতেছি।

শারদাচরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

সদানন্দ মাটি লইয়া একটা তাল পাকাইল, তাহার পর গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া হাতমুখ ধুইয়া শারদার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, চল শারদা বাড়ি যাই।

শা। তুমি ওসব কি করিলে?

স। তাহা ত চক্ষেই দেখিলে।

শা। কৈ, শিবপূজার মাটি লইলে না?

স। না। আর শিবপূজা করিব না।

শা। কেন?

স। আর একদিন বলিব।

তখন দুইজনে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিল। বাটী আসিয়া সদানন্দ সেরাত্রের মত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

রাত্রে আহার করিবার জন্য ছলনা, পিসিমা ক্রমে ক্রমে ডাকিতে আসিলেন, কিন্তু সে দ্বার খুলিল না। ভিতর হইতে বলিল, আজ তাহার বড় শরীর খারাপ হইয়াছে। শুভদা দেখিতে আসিলেন, কিন্তু তখন সদানন্দ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন সকাল হইলে সে আবার উঠিল, মাঠে গেল, আহার করিতে আসিল, হাসিয়া গান গাহিতে লাগিল, নিত্যকর্ম প্রতিদিন যাহা করে তাহাই করিতে লাগিল; কেহ বুঝিল না যে সে প্রতিদিন পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে; কাল যেমন ছিল, আজ ঠিক তেমনটি আর নাই! ক্রমে ১৬ই আষাঢ় ছলনার বিবাহের দিন আসিল। আজি সকলের মুখেই আনন্দ, সকলের মনেই উৎসাহ ; সদানন্দর বসিবার অবকাশ নাই, হারাণ মুখুজ্যের চিৎকারের শেষ নাই, পিসিমাতার

চক্ষুজলের অর্গল নাই—বাটীতে যে আসিতেছে, তাহাকেই কাঁদিয়া জানাইতেছে যে, এমন সুখের দিনেও ললনার জন্য তাঁহার মনে একতিল সুখ নাই—বোধ হয় অনেকেই তাঁহার সহিত এ ব্যথা বুঝিতেছে; কেবল শুভদা আজি বড় শ্রান্ত, বড় ধীর।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, অনেক বাজনা-বাদ্য বাজিল, অনেক লোক জমা হইল—তাহার পর শুভক্ষণে শুভলগ্নে ছলনাময়ীর বিবাহ হইয়া গেল।

আজ গ্রামময়, কৃপণ হরমোহনের সুখ্যাতির একটা সাড়া পড়িয়া গিয়েছে; শত্রুতেও মনে মনে স্বীকার করিল যে, হাঁ, মনটা দরজা বটে!

মুখের সম্মুখে কেহ তাঁহার গুণগান করিলে, নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে বৃদ্ধ হরমোহন বলেন, কি আর করি বল, একটি বৈ ছেলে নয়, তার ওখানে বিবাহ করিতে ইচ্ছা—আমি আর তাহাতে অমত কেন করিব? আর গ্রামের মধ্যে আমরাই ওদের পালটি ঘর—প্রতিবাসীকে একটু দেখিতেও হয়!

শারদাচরণ একথা শুনিয়া অলক্ষ্যে ভ্রূ কুঞ্চিত করিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনেক কাজ ছিল, অনেক কষ্টে তাহা সমাধা হইয়া গিয়াছে! এখন আরাম করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে বেশ লাগে, কিন্তু দুই-চারিদিন পরে সে আরামটা আর তেমন করিয়া উপভোগ করিয়া উঠিতে পারা যায় না। নিতান্ত আলস্যভাবে নিষ্কর্মার মত বসিয়া থাকিতেও কেমন ব্যাজার বোধ হয়। ছলনাময়ীর বিবাহ দিয়া, লুকাইয়া লুকাইয়া হরমোহনকে বেশ দু পয়সা ঘুষ দিয়া হত্যাপরাধে ধৃত আসামীর খালাস পাওয়ার মত, বিছানায় পড়িয়া মনের আনন্দে পাশবালিশ জড়াইয়া, এপাশ ওপাশ করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া সদানন্দ দুই-চারিদিন নির্বিবাদে কাটাইয়া দিল, তাহার পর বোধ হইতে লাগিল যে, শয্যাটা একটু গরম, বালিশগুলো একটু শক্ত হইয়াছে, ঘরটার ভিতর একটু অধিকমাত্রায় অন্ধকার ঢুকিয়াছে, সদানন্দ উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সমস্তদিন ধরিয়া হইতেছিল, তাহা তখনও শেষ হয় নাই; কালো মেঘগুলা ছোটখাট বাতাসে দুই-চারি পা করিয়া মাঝে মাঝে সরিয়া দাঁড়াইতেছে বটে, কিন্তু জল বর্ষাইতে ছাড়িতেছে না—ছাড়িবেও না, সদানন্দ অন্ততঃ এইরূপ মনে করিয়া লইল; তাহার পর মাথায় ছাতা দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ এপথ ওপথ করিয়া, কাপড় ভিজাইয়া, একপা কাদা লইয়া হারাণচন্দ্রের বাটীর ভিতরে আসিয়া খাড়া হইল। শুভদা বোধ হয় রন্ধনশালায় ছিলেন, সদানন্দ সেদিকে গেল না; পিসিমাতা সম্ভবতঃ পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সে খোঁজ সে লইল না। পা ধুইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া যে ঘরে মাধবচন্দ্র শয়ন করিত সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনেকদিন হইতে মাধবচন্দ্রকে আর দেখা হয় নাই, আজ তাহার কথা একটু কহিব। ললনা চলিয়া যাইবার পর হইতেই সে ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হইয়াছে। নিতান্ত বহুদর্শী বিজ্ঞের মত সকল বিষয়েই সে একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া মতামত

প্রকাশ করে, যা তা খাইতে চাহে না; যা তা বিষয়ে বাহানা করে না, অনেক সময় প্রায় কথাই কহে না, নিঃশব্দে দার্শনিকের মত বালিশগুলা এক করিয়া হেলান দিয়া আপনমনে বসিয়া থাকে, কেহ তাহার নিকট আসুক আর না আসুক, সে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। আজও সেইরূপ বসিয়াছিল; সদানন্দ আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলে সে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, সদাদাদা, তুমি আমার কাছে আস না কেন?

স। আমার কত কাজ ছিল ভাই।

মা। সব হয়ে গেছে?

স। হাঁ।

মা। ছোটদিদি কবে ফিরে আসবে?

স। আর তিন – চারদিন পরে।

মা। দেখ সদাদাদা, অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলা হয় না —

স। কেন?

মা। তোমাকে কখন একলা পাই না, তাই হয় না।

সদানন্দ নিকটে বসিল; বলিল, একলা কেন মাধু?

মা। চুপিচুপি তোমাকে বলতে দিদি বলে গিয়েছিল।

স। কে, মাধু?

মা। দিদি; বড়দিদি যে রাত্তিরে চলে গেল—তুমি তখন এখানে ছিলে না কিনা তাই, তুমি ফিরে এলে তোমাকে বলতে বলে গিয়েছিল যে, দিদি চলে গেছে।

সদানন্দ আরো একটু কাছে আসিয়া, তাহার অঙ্গে হাত দিয়া বলিল, কেন গেল মাধু? কেউ গালাগালি দিয়েছিল?

মা। কেউ না।

স। তবে কেন গেল?

মা। আমিও যাব।

স। ছিঃ—

মাধব একটু হাসিল, তাহার পর বলিল, আর কেউ জানে না। কেবল আমি জানি আর দিদি জানে। সে আমার আগে গেছে—আমার জন্যে সব ঠিক করে আমাকে নিয়ে যাবে, সেখানে দুজনে খুব সুখে থাকব। মাধবচন্দ্র তাহার মুখখানা অতিরিক্ত প্রফুল্ল করিয়া আবার একটু হাসিল; তাহার পর ফিরিয়া বলিল, দিদি এসে নিয়ে যাবে।

সদানন্দ বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, কবে?

মা। যবে আমার সময় হবে।

স। মাধব, এসব কথা তোমাকে কে শেখালে?

মা। বড়দিদি।

স। সে তোমাকে নিয়ে যাবে বলেছিল?

মা। হাঁ—

স। আর যদি না নিয়ে যায়?

মা। কেন যাবে না? নিশ্চয় যাবে!

স। যদি না নিয়ে যায়, তাহলে তুমি একা যেতে পারবে কি?

মাধব একটু বিমর্ষ হইল, ভাবিয়া দেখিল; তাহার পর বলিল, কি জানি!

সদানন্দও চুপ করিয়া রহিল। মাধব আবার কহিল, সদাদাদা, সেখানে একলা যাওয়া যায় কি?

স। যায়। না হলে তোমার দিদি গেল কি করে?

মা। আমিও তবে যেতে পারব?

স। পারবে।

মাধব আবার একটু ভাবিল, পরে অধিক দুঃখিতভাবে কহিল, কিন্তু কেমন করে যাব—আমার গায়ে আর একটুও জোর নেই। সদানন্দ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে বলিতে লাগিল, দিদি যখন যায় তখন দিদির গায়ে খুব জোর ছিল, আমি কিন্তু কেমন করে যাব? এখন আমি একবার দাঁড়াতেও পারিনে—অত দূর কি যেতে পারব?

সদানন্দের চক্ষে জল আসিল; অন্ধকারে মাধব তাহা দেখিল না। সদানন্দ দেখিতে লাগিল যে মাধবের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, আর কিছুদিন—তাহার পর সব ফুরাইয়া যাইবে। সে ভাবিল শুভদার কথা, সে ভাবিল ললনার কথা, সে দেখিল, সে একটু ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছে, পাঁচজনকে জড়াইয়া লইয়া আর তেমন চিন্তাশূন্য আনন্দে দিনাতিবাহিত হয় না, কালীনামগুলা আর তেমন করিয়া গাওয়া হয় না, তেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না, তেমন করিয়া আনন্দ করিতে পারে না। সে সুখী ছিল, অসুখী হইয়াছে, বিবাগী ছিল সংসারী হইয়াছে। চক্ষের জল মুছিয়া সদানন্দ আজ প্রথমে মনে করিল যে, বাঁচিয়া থাকিয়া তেমন সুখ হয় না; যে জীবিত আছে তাহারই কষ্ট আছে, যে মরিয়াছে এ জ্বালার সংসারে সে বাঁচিয়াছে। সে রাত্রে সদানন্দ অনেক ভাবিল; যাইবার সময় ললনা তাহাকে ভুলিয়া যায় নাই, সেকথা মনে পড়িল; মাধবচন্দ্র মরিতেছে, একথাও স্মরণ হইল; আর শুভদা—তাহার মনে হইল যে, ললনা মরিয়া তাহার যত দুঃখকষ্ট সমস্তই তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া গিয়াছে।

মাধবচন্দ্রের মনেও সে রাত্রে খুব সুখ ছিল না। মধ্য হইতে তাহার একটা দুর্ভাবনা আসিয়া জুটিয়াছে। এতদিন সে নিশ্চিন্ত ছিল যে, সময় হইলে ললনা আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে, কিন্তু সদাদাদা একটু অন্যরূপ বলিয়াছে—তাহার শরীরে আর একটুও সামর্থ্য নাই, সেস্থলে কেমন করিয়া সে অতদূর যাইতে পারিবে? ভাবিয়া ভাবিয়া অনেক রাত্রে সে নিশ্চয় করিল যে, তাহার দিদি কখন

মিথ্যা বলিবে না—যথাসময়ে নিশ্চয় আসিবে। মাধবচন্দ্র তখন অনেকটা শান্তমনে নিদ্রা গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

আরো কতদিন কাটিয়া গেল। ছলনা বাপের বাটী ফিরিয়া আসিল, পাড়ার মেয়েরা আর–একবার নূতন করিয়া কন্যা –জামাতা দেখিয়া গেলেন, কত হাসি কত তামাশা গড়াইয়া গেল, হরমোহন নিজে এখানে আসিয়া সকলকে মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া ব্যায়ানঠাকুরানীর নমস্কার গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া গেলেন, হারাণচন্দ্র কোমরে ফর্সা চাদর বাঁধিয়া বামুনপাড়ার প্রত্যেক দোকানে একবার করিয়া বসিয়া তাহাদিগকে মোহিত করিলেন—এইরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়া গেল।

আজ মাধবচন্দ্রের পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইয়াছে। শয্যার উপর ছটফট করিতেছে এবং পার্শ্বে, শিয়রে, পদতলে পিসিমাতা, কৃষ্ণঠাকুরানী, ছলনা প্রভৃতি বসিয়া আছে। শুভদা এখানে নাই—তিনি রন্ধনশালায় বসিয়া কতক রাঁধিতেছেন, কতক কাঁদিতেছেন, সদানন্দ ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে, আর হারাণচন্দ্র ‘এই আসিতেছি’ বলিয়া ঘণ্টাতিন হইল বাহির হইয়াছেন, এখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। সকলে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছেন; কৃষ্ণঠাকুরানী মাধবের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং ডাক্তারের অপেক্ষায় মনে মনে সময় গুনিতেছেন।

ক্রমে সন্ধ্যার একটু পরে ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিলেন; তিনি আজ ছয়–সাত দিবস হইতে নিত্য আসিতেছেন, নিত্য দেখিতেছেন, পীড়া কিছুতেই কমিতেছে না বরং বাড়িতেছে তাহা জানিতেন, বাঁচিবে না তাহাও বুঝিয়াছিলেন। আসিবার ইচ্ছাও ছিল না, কিন্তু সদানন্দর পীড়াপীড়িতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঘরে আসিয়া ডাক্তারে যাহা দেখে তাহা তিনি দেখিলেন, তাহার পর বাহিরে আসিয়া সদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, সদানন্দবাবু, আজ বেশ সাবধানে থাকিবেন; ছেলেটি বোধ হয় আজ রাত্রে বাঁচিবে না।

সদানন্দও তাহা জানিত।

অনেক রাত্রে হারাণচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন, চোরের ন্যায় কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরের বৃত্তান্ত যতটা সম্ভব অবগত হইলেন, তাহার পর দ্বার ঈষৎ খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, এখন কেমন আছে?

কেহ কথা কহিল না। শুধু শুভদা বাহির হইয়া আসিল; খাবার থালা সম্মুখে রক্ষা করিয়া নিকটে বসিল।

হারাণ বলিলেন, মাধু এখন কেমন?

বোধ হয় ভাল নয়।

ভাল নয়?—একটু থামিয়া বলিলেন, আমার শরীরও ভাল নয়।

কি ভাবিয়া তিনি যে একথা বলিলেন, কি মনে করিয়া যে তিনি নিজের অসুস্থতার কথা উল্লেখ করিলেন তাহা বলিতে পারি না এবং ইহাতে সত্যাসত্য কতদূর ছিল তাহাও অবগত নহি—কিন্তু একথা শুভদার কানে প্রবেশ করিল না। হারাণচন্দ্র মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন; স্ত্রীর নিকট শারীরিক অসুস্থতার কথা কহিয়া তাহার একটা স্নেহময় প্রত্যুত্তর না পাওয়া, তাঁহার নিকট এরূপ অস্বাভাবিক বোধ হইল যে হারাণচন্দ্র আপনাকে যথেষ্ট অপমানিত মনে করিলেন। তিনি নেশা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাই সেই সামান্য অপমানাঙ্কুর দুই-চারি মুহূর্তের মধ্যেই মস্তিষ্কের ভিতর বেশ ডালপালা ছড়াইয়া দিল। হারাণচন্দ্র বিরক্তভাবে থালা ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, আর খাব না—শেষে কি মরে যাব? হারাণচন্দ্র উঠিয়া আসিয়া আচমন করিয়া নির্দিষ্ট কক্ষে নির্দিষ্ট শয্যায় যথারীতি শয়ন করিলেন; মনে মনে বোধ হয় স্থির করিয়া লইলেন যে, তাঁহারও যথেষ্ট অসুখ হইয়াছে।

এদিকে শুভদা হাত ধুইয়া মাধবের নিকটে আসিয়া বসিলেন। দেখিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী বলিলেন, হারাণ কোথায়?

তাঁর শরীর অসুখ হয়েচে—শুয়েছেন।

কৃষ্ণঠাকুরানী একটু মৌন হইয়া রহিলেন; তাহার পর মৃদু মৃদু বলিলেন, মানুষের মায়াদয়া থাকে না, কিন্তু চক্ষুলজ্জাও ত একটু থাকতে হয়!

রাসমণি একথা শুনিয়া ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিলেন।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। কৃষ্ণঠাকুরানী অনেক মুমূর্ষুর পার্শ্বে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন, অনেক মৃত্যু দেখিয়াছিলেন, তাঁহার বোধ হইল, মাধবের অল্প শ্বাস হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে মাধব কহিয়া উঠিল, বড় মাথা ধরেচে।

কৃষ্ণপিসিমাতা মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। একটু থামিয়া আবার কহিল, বড় পেট কামড়াচ্চে, বড় গা বমিবমি করচে।

সকলে সকলের মুখপানে চাহিয়া দেখিল যেন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মনের কথা মুখের উপর পড়িতে চেষ্টা করিল।

পুনর্বার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে অতিবাহিত হইল—সকলেই মৌন ম্লানমুখে শেষটার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে জড়াইয়া জড়াইয়া বড় কাতরভাবে মাধব বলিল, বড় তেষ্টা।

পিসিমাতা দুগ্ধের পরিবর্তে মুখে একটু গঙ্গাজল দিলেন। আগ্রহে মাধব সেটুকু সম্পূর্ণ পান করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নিস্তব্ধ পড়িয়া রহিল।

ক্রমে শ্বাস বাড়িয়া উঠিল, সকলেই তাহা লক্ষ্য করিলেন; কৃষ্ণঠাকুরানী নাড়ি দেখিতে জানিতেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া হাত দেখিয়া সদানন্দকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, এবার নীচে শোওয়াইতে হবে।

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল।

রাসমণির কর্ণে একথা প্রবেশ করিয়াছিল; তিনি অস্ফুটে কাঁদিয়া উঠিলেন—আর দেখ কি সদানন্দ?

ছলনা কাঁদিয়া উঠিল, কৃষ্ণপিসিমাতা কাঁদিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাধবেরও প্রায় অচেতন দেহ নীচে নামিয়া আসিল।

বহুক্ষণ পরে মাধব আর একবার হাঁ করিল—কৃষ্ণপিসিমাতা পূর্বের মত তাহাতে আর একটু জল দিলেন। মাধব যেন একটু বল পাইল—একবার চক্ষু চাহিল, তাহার পর মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, সদাদাদা,—দিদি—এসেছে।

ছলনাময়ী নিকটে বসিয়াছিল, আজি সমস্ত রাত্রি সে নিদ্রা যায় নাই,—শিহরিয়া সে জননীর আরো নিকটে ঘেঁষিয়া বসিল; রাসমণির সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

আর কিছুক্ষণ পরে, মাধবচন্দ্র অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল, মাথা নাড়িতে লাগিল—প্রবল শ্বাস হইয়াছে; দেখিয়া শুনিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী কাঁদিয়া বলিলেন, আর কেন? সময় হয়েচে—রাসমণি চিৎকার করিয়া উঠিলেন—পরকালের কাজ কর—তুলসীপাতা—

সকলেই তখন উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিলেন। চিৎকার-শব্দে হারাণচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মাধবকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনা হইতেছে—তিনিও চিৎকার করিয়া পুত্রের শরীর তুলসীতলায় ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন—কাঁদিয়া ডাকিলেন, বাবা— মাধু—

সেও বোধ হয় গোঁ-গোঁ করিয়া একবার কহিল, বা-বা।

দশম পরিচ্ছেদ

বিচিত্র হর্ম্যে বিচিত্র কৌচের উপর অপূর্বসুন্দরী মালতী, কক্ষ উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছে। নিকটে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত সাইড বোর্ডের উপর রৌপ্য শামাদানে বাতি জ্বলিতেছে। তাহারই আলোকে মালতী একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিল। যে কক্ষে মালতী বসিয়া আছে তাহা অতিরিক্ত সুসজ্জায় সজ্জিত। সমস্ত হর্ম্যতল বহুমূল্য বিচিত্র কার্পেটে মণ্ডিত; দেওয়াল নানাবিধ লতাপাতা ফুলেফলে বিচিত্র, তাহার উপর বহুবিধ তসবির, বহুমূল্য অয়েল পেন্টিং, অলিওগ্রাফ, ফটোগ্রাফ প্রভৃতিতে বিশেষ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। আশেপাশে বহুবিধ দেয়ালগিরি গৃহসজ্জা বৃদ্ধি করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের বেলওয়ারি কাঁচের ভিতর দিয়া লাল-নীল-সবুজ নানা বর্ণের আলোকখণ্ড ইতস্ততঃ ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড আয়না—আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া গৃহের উজ্জ্বলতা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে, তৎসংলগ্ন মর্মরপ্রস্তরের মেজ এবং শ্বেতপ্রস্তরের ঝরনা, তদুপরি স্থাপিত রহিয়াছে; চতুর্দিকে শ্বেত কৃষ্ণ পীত বর্ণের মনুষ্য প্রতিকৃতি, সে আলোকে জীবন্ত বোধ হইতেছে। এই রাজোচিত হর্ম্যে মালতী—জীবন্ত স্বর্ণপ্রতিমা—একাকী বসিয়া আছে। কত রূপে যে এ পার্থিব সৌন্দর্য সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়া সে বসিয়া আছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া মুগ্ধনয়নে সে শোভা দেখিবার জন্য সেখানে আর কেহ ছিল না, তাই মালতী আপন মনে পুস্তক পাঠ করিতেছে। পাঠ আর ছাই করিতেছে; ছত্রের পর ছত্র সরিয়া যাইতেছে, পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছে, কিন্তু একবর্ণও মনের ভিতর প্রবেশ করিতেছে না। সে ইতিপূর্বেই বোধ হয় কাঁদিতেছিল, কেননা শুষ্ক জলের দাগ এখনও তাহার কপোলের উপর প্রতীয়মান হইতেছে। এ সুখ-ভবনে সে কেন যে কাঁদিতেছিল তাহা জানি না, কিন্তু কাঁদিতেছিল তাহা নিশ্চয়; এবং সেই কান্নাই থামাইবার জন্য

পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। মালতী নিরাভরণা, মালতী সামান্য বস্ত্রপরিহিতা, মালতী কাঁদিতেছিল, মালতীর মনে সুখ নাই। পুস্তক বোর্ডের উপর বন্ধ করিয়া ফেলিয়া দিল, নিঃশব্দে কৌচের বাজুতে মস্তক ন্যস্ত করিয়া—বসিয়া রহিল। পুনর্বার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল, এবার তাহা রোধ করিবার প্রয়াস করিল না।

কাজেই একটির পর একটি করিয়া অশ্রু কৌচের মখমল চাদরের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ কক্ষে প্রবেশ করিলেন; অত পুরু গালিচার উপর পদশব্দ হয় না, কাজেই এ আগমন মালতী জানিতে পারিল না, সে যেমন কাঁদিতেছিল তেমনই কাঁদিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ নিস্তব্ধে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আরো একটু নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর ডাকিলেন, মালতী!

মালতী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল; বলিল, এসো।

সুরেন্দ্রনাথ নিকটে উপবেশন করিলেন। তাহার দুটি হাত নিজের হাতে লইয়া স্নেহার্দ্র-স্বরে কহিলেন, আবার কাঁদছিলে?

মালতী হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এইজন্য ইচ্ছা থাকিলেও 'না' বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

কেন কাঁদিতেছিলে?

মালতী কথা কহিল না।

তিনিও কিছুক্ষণ কিছুই বলিতে পারিলেন না। পরে তাহার হাত দুটি আরো একটু টিপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, দুঃখ এই যে এত চেষ্টাতেও তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না, হৃদয়ের সহস্র কামনাতেও তোমার মন পাইলাম না।

মালতী একটা উত্তর খুঁজিল কিন্তু পাইল না, আরো একটা কাজ তাহার দ্বারা হইল না। ইতিপূর্বেই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যাহাই হউক

আর কাঁদিবে না কিন্তু অশ্রুর উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারিল না। তাহারা যেমন পড়িতেছিল, তেমনিই পড়িতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, কি করলে যে একজন সুখী হইতে পারে তাহা মানুষে বুঝিতে পারে না এবং দেবতারা পারেন কি না তাও বলিতে পারি না। তৃপ্তির জন্য, সুখের জন্য এ ভবন এমন করিয়া সাজাইলাম, এ দেবীপ্রতিমা এ ভবনে এত যত্নে প্রতিষ্ঠিত করিলাম, কিন্তু সুখী হইতে পারিলাম কি? সুখের কথা ছাড়িয়া দিই— বোধ হয় আমার অসুখের মাত্রাই বৃদ্ধি হইয়াছে। যাহাকে সুখী করিতে এত করিলাম তাহাকে একদিনের জন্যও সুখী দেখিলাম না, তোমাকে পাইয়া অবধি ও অধরে একতিলের জন্যও হাসির রেখা দেখিলাম না,— বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রনাথ তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া নিতান্ত অধীরভাবে সে অশ্রুমলিন মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন; বলিলেন, মালতী, কতদিন কাটিয়া গেল কিন্তু কিছুতেই কি তুমি প্রফুল্ল হইবে না, কিছুতেই কি একবার হাসিয়া চাহিবে না?

মালতী হাত তুলিয়া চক্ষু মুছিল।

এ সৌন্দর্য যে কি, এ রূপে যে কত মুগ্ধ হইয়াছি তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। মনের সাধে সাজাইব বলিয়া কত অলঙ্কার আনিলাম, কত বস্ত্র সংগ্রহ করিলাম, কিন্তু একদণ্ডের তরেও তুমি পারিলে না। মালতী! তুমি কি আমাকে দেখিতে পার না?

মালতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর মস্তক স্থাপিত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া আসিল। আদর করিয়া তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া গদগদ স্বরে কহিলেন, তুমি যে আমাকে দেখিতে পার না তাহা বলি না, কিন্তু আমার আরও অনেক কথা মনে হয়—তুমি আমার অপরাধ লইও না— আমার যাহা মনে হয়—আজ তাহা বলিয়া যাই—আমার বিশ্বাস তুমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছ, নীচ স্ত্রীলোকে আত্মসুখের জন্যই সে পন্থা অবলম্বন করিয়া

থাকে এবং বস্ত্রালঙ্কার ধনরত্ন ঐশ্বর্য ভিন্ন তাহাদের সুখ যে আর কিসে আছে তাহা জানি না, কিন্তু তোমাকে তাহাদের মত বোধ হয় না, সেইজন্য বুঝিতেও পারি না কি করিলে তুমি সুখ পাইবে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে তুমি এতদিনে সুখী হইতে—বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রনাথ অল্পক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন; পরে ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন, মালতী! তোমার স্বামী জীবিত আছেন কি?

মালতী ক্রোড়ের উপর মাথা নাড়িয়া জানাইল যে তাহার স্বামী জীবিত নাই।

তবে বল, তোমাকে বিবাহ করিলে কি সুখী হও? বল—বল, আমি তাহাতেও কুণ্ঠিত নহি।

এইবার মালতী গড়াইয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িল; হাত দিয়া তাহা জড়াইয়া ধরিল, তাহাতে মুখ লুকাইল। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তুলিবার চেষ্টা করিলেন না, বুঝিলেন চক্ষের জলে তাঁহার পদদ্বয় সিক্ত হইতেছে, তথাপি উঠাইলেন না, বরং দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

বহুক্ষণ গত হইল; তাহার পর ম্লানভাবে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—ভগবান জানেন আমার কি হইয়াছে। তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছি, কি ও অতুল রূপে উন্মত্ত হইয়াছি তা বলিতে পারি না, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান আমার আর নাই, ভালমন্দ বুঝিয়া দেখিবার ক্ষমতা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তোমার একটি কথার জন্য প্রাণ পর্যন্তও বুঝি দিতে পারি।

ঈশ্বর জানেন, তোমার মন পাইবার জন্য মিথ্যা বলিতেছি না, সত্যই বলিতেছি; আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছি—যাহা হইবার হইবে—তুমি একবার বল, তোমাকে বিবাহ করিলেই যদি সুখী হও, তাহাই করিব। জাতি, কুল, মান, এতবড় বংশ, কিছুই মনে করিব না। তাহার পর সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; কিছুক্ষণ থামিয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া অতি ধীরে, অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, তাহার পর মালতী, আমাদিগের মত মনুষ্যের পরিষ্কার পথ

পড়িয়া আছে—যখন সহ্য করিতে পারিব না, তখন আত্মহত্যা করিয়া নরকের পানে সোজা চলিয়া যাইব।

মালতী আর সহ্য করিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ওকথা তুমি বলিও না। তুমি আমার প্রাণ দিয়াছিলে, লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে, দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলে—না হইলে এখনও বোধ হয় বাঁচিয়া থাকিতাম না; আমি নীচ, কুৎসিত; কিন্তু অকৃতজ্ঞ হইতে পারিব না। তোমার দয়া, তোমার স্নেহ, এ জীবনে কখন ভুলিব না—এ সকলের প্রতিশোধ কি আমি এইরূপে দিব?

সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কিসে প্রতিশোধ হয় তাহা ঈশ্বর জানেন, আমি জানি না। তোমাকে বলিব কি, যে যন্ত্রণা, যে অন্তর্দাহ আজ মাসাধিক কালের উপরও ভোগ করিয়া আসিতেছি। মনে দুঃখ করিও না, কিন্তু বলিতে লজ্জা হয় যে, এত অল্পদিনে স্ত্রীলোকের এরূপ দাস হইয়া পড়িয়াছি; একজন—একজন—তুমি যেই হও—তুমি যেই হও—কিন্তু আমি ত স্বর্গীয় পিতৃপিতামহগণের বংশ সম্মান লুপ্ত করিতেও সম্মত হইয়াছি।

মালতী সেইরূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে কহিল, আমি তোমার দাসীরও দাসীর যোগ্য নই—আমি কে যে আমার জন্য তুমি এতই সহিবে—তোমার কেশাগ্রও বিসর্জন দিবে? আমি আজন্ম দুঃখী—এত করুণা এ জীবনে কখন পাই নাই। তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, যদি শেষ হয়, ঈশ্বর করুন যেন ইহাই আমার শেষ হয়।

সুরেন্দ্রনাথ সযত্নে তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন; তাহার পর পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই ত তুমি সুখ পাইতেছ না।

মালতী চক্ষে অঞ্চল দিয়া কহিল, আমরা বড় দরিদ্র।

সু। কিন্তু আমি ত দরিদ্র নহি। আমার যাহা আছে, তোমারও ত তাহা আছে।

মা। আমি নিজের কথা বলিতেছি না।

সু। তবে কাহার কথা? তোমার ত কেহ নাই!

মা। ভগবান জানেন এখন আর কেহ আছে কিনা, কিন্তু যখন চলিয়া আসিয়াছিলাম তখন সব ছিল।

সু। সে কি? নৌকাডুবি হইয়া—

মা। সেসব মিছে কথা, নৌকাডুবি আদতে ঘটে নাই।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হয় একবার মনে হইয়াছিল যে, এসকল ছলনা, না সত্য কথা? কিন্তু সে-মুখে ছলনা সম্ভবে না—সে-চক্ষু, সে-অশ্রুজলের মধ্যেও যে প্রতারণা, মিথ্যাকথা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে তাঁহার তাহা বোধ হইল না। কিছুক্ষণ পরে ডাকিলেন, মালতী।

কি?

সব সত্য?

এবার মালতী মুখপানে চাহিয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ লজ্জিত হইলেন, স্বহস্তে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, তবে সব কথা খুলিয়া বল।

মালতী ধীরে ধীরে তখন তাঁহার জানুর উপর মাথা রাখিয়া কখন কাঁদিয়া, কখন স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, জন্মাবধি দুঃখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াছি—কিন্তু আমাদের সব ছিল। পিতা আমার যথাসাধ্য দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগিনী আমি এক বৎসরের মধ্যেই বিধবা হইলাম—যাঁহার সহিত বিবাহ হইল তাঁহাকে বোধ হয় একবারের অধিক দেখিতেও পাই নাই। আমি বাপের বাটীতে ছিলাম, সেই অবধি পাঁচ বৎসর প্রায় সেইখানেই থাকিলাম। পিতা আমাদিগের গ্রাম হলুদপুর হইতে প্রায় অর্ধ ক্রোশ দূরে এক জমিদারের নিকটে কর্ম করিতেন। সামান্যই বেতন পাইতেন, কিন্তু তাহাতেই আমাদের একরূপ দুঃখ-কষ্টে চলিয়া যাইত। এইসময় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, তোমাদের বাড়িতে তখন কে কে ছিলেন?

মা। সবাই ছিলেন—বাবা, মা, পিসিমা, আমরা দুই বোন, আর একটি ছোট ভাই। তাহার পর চুরির অপরাধে বাবার চাকুরি যায়—সেই অবধি নিত্য ভিক্ষা করিয়া কোনদিন আমাদের আহার হইত, কোনদিন হইত না। মা আমার সতীলক্ষ্মী ছিলেন—চাহিয়া চিন্তিয়া যাহা মিলিত তাহাতে অপরাপর সকলকে খাওয়াইয়া মা প্রায় নিত্য উপবাসী থাকিতেন; এমন কি একসঙ্গে তিনদিনও—এই সময় মালতী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে আপনাকে কিঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল, বাবা কিন্তু এসব দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না। গাঁজা-গুলি খাইতেন, যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতেন—হয়ত বা চার-পাঁচদিন ধরিয়া বাড়িতেই আসিতেন না।

আমার ছোটভাই মাধব প্রায় একবৎসর হইতে পীড়ায় ভুগিতেছিল, চিকিৎসা ভিন্ন কিছুতেই আরোগ্য হইতে পারিতেছিল না, বোধ হয় এতদিনে সে আর বাঁচিয়াও নাই—

এ সময়ে সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

তাহার পর মালতী কৃষ্ণঠাকুরানীর কথা বলিল, সদানন্দর কথা বলিল, শেষে বলিল ছলনার কথা। মালতী কহিল, ছলনার বিবাহের বয়স হইল, কিন্তু দরিদ্র বলিয়া কেহ বিবাহ করিতে চাহিল না। বিবাহ না হইলে ব্রাহ্মণের ঘরে জাতি যায়—আমাদেরও জাতি যায়-যায় হইল; মা আমার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। পিতা ফিরিয়াও চাহিতেন না, শুধু ভরসা ছিল সদানন্দ, কিন্তু তিনিও তখন দেশে ছিলেন না—কাশীতে তাঁহার পিসিমাতাকে লইয়া গিয়াছিলেন।

পিতার চাকুরি যাইবার পর হইতে ক্রমে ক্রমে এইরূপে ছয়মাস কাটিয়া গেল। পাড়া-প্রতিবেশীতে আর কত সাহায্য করিবে? সদাদাদা কাশী যাবার সময় যে পঞ্চাশ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন তাহাও ফুরাইয়া গেল—এ সময়ের কথা আর

বলিতে পারি না—মালতী আবার কাঁদিতে লাগিল, সুরেন্দ্রনাথও কাঁদিলেন; কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, আর কাজ নাই—অন্যদিন বলিও।

মালতী চক্ষু মুছিয়া বলিল, আজই বলি। লোকে আমাকে সুন্দরী বলিত, আমি ভাবিতাম কলিকাতায় গিয়া উপার্জন করিব। একদিন রাত্রে গঙ্গার তীরে আসিলাম, মনে করিলাম তীরে তীরে কলিকাতায় যাইব—তাহা হইলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না, কাহাকেও পথও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। ঘাটে আসিয়া দেখিলাম অদূরে একটা প্রকাণ্ড নৌকা পাল ভরে যাইতেছে, আমি সাঁতার জানিতাম, নৌকা দেখিয়া ভাবিলাম নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া নৌকার হাল ধরিয়া থাকিব। শুনিয়াছিলাম আমাদের দেশ হইতে কলিকাতা অধিক দূর নহে—তবে ঠিক জানিতাম না যে কতদূর। ভাবিলাম রাত্রিশেষে নৌকা নিশ্চয় কলিকাতায় পৌঁছিবে, আমিও তখন নামিয়া যাইব। জলে পড়িলাম, সাঁতার দিয়া কিছুদূর আসিলাম—এই সময়ে কাপড়খানা হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে জড়াইয়া গেল, আমিও প্রায় ডুবিবার মত হইলাম, কিন্তু বহু ক্লেশে অবশেষে সেখানা খুলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু হাত হইতে সেটা পিছলাইয়া কোথায় সরিয়া গেল, এইসময় নৌকাখানাও কাছে আসিয়া পড়িল; আমার হাতপা-ও ধরিয়া গিয়াছিল—ভাবিলাম আর ফিরিয়া যাইতে পারিব না—তাই হালটা ধরিয়া ফেলিলাম।

নৌকা চলিতে লাগিল, আমিও সাহস করিয়া তাহা ছাড়িতে পারিলাম না, ভয় হইল, তাহা হইলেই ডুবিয়া যাইব। এইরূপ বহুদূর চলিয়া আসিলাম। তখন আর ফিরিয়া যাইবারও উপায় ছিল না। অবশেষে স্থির করিলাম, প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিতে অনেক স্ত্রীলোকেই আসিয়া থাকে, তাহাদের নিকট বস্ত্রও থাকে—ভিক্ষা করিয়া একটা চাহিয়া লইব—বিবস্ত্রা দেখিলে স্ত্রীলোকের দয়া হইবেই—। তারপর সব তুমি জান।

সুরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, যেজন্য এত করিলে এতদিনে তাহার কোন উপায় করিয়াছ কি?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

সু। তাহা জানি। আর তাই ভাবিতেছি, যে মুখ ফুটিয়া একটি কথা বলিতে পারে না সে কোন্ সাহসে এতটা করিয়াছে।

মালতী চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

সু। মাসে মাসে কত টাকা হইলে তাঁহাদের চলে?

মা। কুড়ি টাকা।

সু। প্রতি মাসে সেখানে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিও।

মা। তুমি দেবে?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিলেন; বলিলেন, দোবো; আরো চাও আরো দোবো।

মালতী মনে মনে কহিল—এতদিনে তাহার জন্ম সার্থক হইল।

সু। তার পরে একটা কাজ করিও—আমাকে বিবাহ করিও—কেননা নরাধম হইলেও—অত শুভ্র হৃদয়ে আমি কলঙ্কের ছাপ লাগিতে দিব না।

মালতী তাঁহার বুকের ভিতর মাথা রাখিয়া অস্ফুটে কহিল, না—

সু। কেন—না? তুমি ভাবিতেছ আমার জাতি যাইবে; কিন্তু আমি এস্থানের জমিদার, আমার অনেক টাকা—যাহার টাকা আছে তাহার জাতি শীঘ্র যায় না।

মা। গোলমাল হইবে।

সু। হইবে। কিন্তু তাহাও অধিকদিন স্থায়ী হইবে না।

মা। বংশ, কুল, মান, সম্ভ্রম?

সু। মালতী! একদিনের জন্যও সেসকল ভুলতে দাও—জগতে আসিয়া অনেক দ্রব্য পাইয়াছি—কিন্তু সুখ কখন পাই নাই; একদিনের জন্য আমাকে যথার্থ সুখী হইতে দাও।—

কথা শুনিয়া মালতীর ভিতর পর্যন্ত কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা চাপিল। ধীরে ধীরে বলিল, আমি তোমার নিকট চিরদিন থাকিব।

সু। ঈশ্বর করুন তাহাই হউক। তুমি চিরদিন থাকিবে, কিন্তু আমি পারিব কি? তুমি সংসার দেখ নাই, কিন্তু আমি দেখিয়াছি। আমি জানি আমাকে বিশ্বাস নাই। যে প্রেমে তুমি চিরজীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিবে, আমি হয়ত কোনদিন তাহা মাঝখানে ছিন্ন করিয়া পলাইয়া যাইব। মালতী! সময় থাকিতে আমাকে বাঁধিয়া ফেল।

মালতী ভাল করিয়া সমস্ত শুনিল, অনেক দিনের পর আর একবার স্থির হইয়া ভাবিয়া লইল—তাহার পর অকম্পিতকণ্ঠে কহিল, বাঁধিয়াছি, পার ইহাই ছিন্ন করিও। ইহার উপর আর বন্ধনের প্রয়োজন নাই।

সু। তোমার নাই কিন্তু আমার আছে।

মা। থাকুক, কিন্তু বিবাহ হইতে পারে না।

সু। কেন, বিধবাকে কি বিবাহ করিতে নাই?

মা। বিধবাকে বিবাহ করিতে আছে, কিন্তু বেশ্যাকে নাই।—

সুরেন্দ্রনাথের সহসা সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল—তুমি কি তাই?

মা। নয় কি? নিজেই ভাবিয়া দেখ দেখি।

সু। ছি ছি!—ওকথা মুখে আনিও না—তোমাকে কত ভালবাসি।

মা। সেইজন্যই মুখে আনিলাম; না হইলে হয়ত বিবাহ করিতেও সম্মত হইতাম।

সু। মালতী!

মা। কি?

সু। সব কথা খুলিয়া বলিবে?

মা। বলিব। তুমি ভিন্ন আমার দেহ পূর্বে কেহ স্পর্শও করে নাই, কিন্তু একজনকে মনপ্রাণ সমস্তই মনে মনে দিয়াছিলাম।

সু। তার পর?

মা। আমাকে বিবাহ করিবার জন্য তাহাকে অনেক সাধিয়াছিলাম।

সু। তার পর?

মা। জাতি যাইবার ভয়ে সে বিবাহ করিল না।

সু। সে মনপ্রাণ ফিরাইয়া লইলে কিরূপে?

মা। সে যেরূপে ফিরাইয়া দিল।

সু। পারিলে?

মালতী একটু মৌন থাকিয়া কহিল, পূর্বেই বলিয়াছি, আমি বেশ্যা—বেশ্যায় সব পারে।

সু। উঃ—সে কি সদানন্দ?

মা। না—আর একজন।

সু। তবে তুমি মানুষ চিনিতে পার নাই—তাহাকে বল নাই কেন? সে তোমাকে ভালবাসিত।

সহসা মালতীর সর্বাঙ্গে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। সেই পাগল ক্ষ্যাপা মুখখানা! মালতীর মনে পড়িল, সেই বৃষ্টির দিন; সে সন্ধ্যার সময় ঘাট হইতে জল আনিতেছিল, পথিমধ্যে বৃষ্টি আসিয়া পড়িল, ভিজিয়া জ্বর হইবার ভয়ে সদানন্দর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মনে পড়িল, সেই প্রথম তাহার নিকট অর্থসাহায্য পাওয়া; তাহার পর নিত্য হাতে গুঁজিয়া দেওয়া; সেই কাশী যাইবার দিন; সেই বালিশের নীচে একরাশ টাকা দেওয়া;—সেই আরো কত কি! মনে পড়িল, দুঃখের সময় সেই সহানুভূতি। নিমিষে তাহার চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া গেল, কিন্তু বহিয়া পড়িবার পূর্বে মালতী তাহা মুছিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি কৌচের বাহুতে হেলান দিয়া চক্ষু মুদিয়া অন্য অনেক কথা ভাবিতেছিলেন, বলিলেন, তারপর?

মা। কলিকাতায় যাইতেছিলাম।

সু। তারপর?

মা। দয়া করিয়া পায়ে স্থান দিয়াছ।

পূর্বোক্ত প্রশ্ন তিনি অন্যমনস্ক হইয়া বলিয়াছিলেন, উত্তর শুনিয়া তাহা বুঝিলেন। উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, মালতী, তুমি রত্ন। রত্ন কুস্থানে পাইলেও গলায় পরিতে হয়।

মা। কে বলিল? যে রত্ন একজন গলায় পরে, অন্যে হয়ত তাহা পায়ে রাখিতেও ঘৃণা বোধ করেন। তুমি আমাকে চরণে স্থান দিও,—আমি রত্ন, তাহাতেই পরম সৌভাগ্য মনে করিব।

সুরেন্দ্রনাথ অল্প হাসিলেন; বলিলেন, মালতী, আমি ভাবিতাম তুমি বোকা, কিন্তু তা তুমি নও—

মালতী অল্প হাসিল। দুঃখে কষ্টে আজ তাহার অধরে প্রথম হাসির রেখা দেখা দিল।

এই সময়ে বাহির হইতে দাসী বলিল, বাবু, অঘোরবাবুর জুড়ি বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন; অঘোরবাবুর? কিন্তু এ বাগানবাড়িতে কেন?

তিনি বলে পাঠিয়েছেন বড় দরকার।

সুরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, মালতী, এখন তবে আসি।

এস। কিন্তু অঘোরবাবু কে?

পরে শুনিও।

অঘোরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিও, তিনি কোথায় বিবাহ করিয়াছেন?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া ফেলিলেন—কেন, পরিচয় আছে নাকি?

বোধ হয় কতক আছে!

একাদশ পরিচ্ছেদ

জন্মিলে মরিতে হয়, আকাশে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহাকে ভূমিতে পড়িতে হয়, খুন করিলে ফাঁসি যাইতে হয়, চুরি করিলে কারাগারে যাইতে হয়, তেমনি ভালবাসিলে কাঁদিতে হয়—অপরাপরের মত ইহাও একটি জগতের নিয়ম। কিন্তু এ নিয়ম কে প্রচলিত করিল জানি না। ঈশ্বর-ইচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চক্ষে জল আপনি ফুটিয়া উঠে, কিংবা মানুষে শখ করিয়া কাঁদে, কিংবা দায়ে পড়িয়া কাঁদে, অথবা চিরপ্রসিদ্ধ মৌলিক আচার বলিয়াই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া কাঁদিতে হয়—তাহা যাঁহারা ভালবাসিয়াছেন এবং তাহার পরে কাঁদিয়াছেন, তাঁহারাই বিশেষ বলিতে পারেন। আমরা অধম, এ স্বাদ কখন পাইলাম না, না হইলে ইচ্ছা ছিল ভালবাসিয়া একচোট খুব কাঁদিয়া লইব, ভালবাসার ক্রন্দনটা মিষ্ট বা কটু পরীক্ষা করিব। আবার ইহাতে বড় আশঙ্কার কথাও আছে, শুনিতে পাই ইহাতে নাকি বুক-ফাটাফাটি কাণ্ডও বাঁধিয়া উঠে, অমনি শিহরিয়া শতহস্ত পিছাইয়া দাঁড়াই—মনে ভাবি এ যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে সহসা গিয়া পড়িব না। অদৃষ্ট ভাল নয়—কি জানি যদি পরীক্ষা করিতে গিয়া শেষে নিজের বুকখানাই ফাটাইয়া লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিতে হয়; এ ইচ্ছার আমি ঐখানেই ইস্তফা দিয়াছি। তবে কৌতূহল আছে। যেখানে কেহ ভালবাসিয়া কাঁদে, আমি উঁকিঝুঁকি মারিয়া তাহা দেখিতে থাকি; বিবর্ণ, শঙ্কিতমুখে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকি, বুঝি এইবার বা ইহার বুকখানা ফাটিয়া যাইবে দেখিতে পাইব, কিন্তু সে যখন অবশেষে চোখের জল মুছিয়া হৃষ্টপুষ্টভাবে উঠিয়া বসে তখন দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া যাই। তবে এমন ইচ্ছা করি না যে, তাহাদের বুকখানা ফাটিয়া যাউক, কিন্তু দেখিবার ইচ্ছাও কি জানি কেন এ পোড়া মন হইতে একেবারে ফেলিয়া দিতে পারি না। আজও সেইজন্য মালতীর এখানে আসিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি তাহা পরে বলিতেছি, কিন্তু

যাহা শিখিয়াছি তাহা এই যে, মানুষ ভালবাসিয়া ঈশ্বরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়, মালতীর মত ভালবাসার এ অশ্রু-বিসর্জন ভগবান-পদপ্রান্তে পদ্মের মত ফুটিয়া উঠে। আপনাকে ভুলিয়া, যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা না করিয়া, পরের চরণে তাহার মত আত্মবলিদানে অজ্ঞাতে শুধু তাঁহারই সাধনা করা হয়—মানুষ জীবন্মুক্ত হয়। লোকে হয়ত পাগল বলে, আমিও হয়ত পূর্বে কত বলিয়াছি—কিন্তু তখন বুঝি নাই যে, এরূপ পাগল জগতে সচরাচর মিলে না; এইরূপ পাগল সাজিতে পারিলেও এ তুচ্ছ জীবনের অনেকটা কাজ হয়।

সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে, কবাট বন্ধ করিয়া মালতী ভূমে লুটাইয়া পড়িল, কত যে কাঁদিল তাহা বলিব না; বুঝি সে ভাবিয়া দেখিতেছিল, বাল্যকালের সে ভালবাসা আর এ ভালবাসায় কত প্রভেদ! মালতী আপনা হারাইয়া ভালবাসিয়াছে, তাহার উপর গভীর কৃতজ্ঞতাও মিশিয়াছে। ছাই নিজের সুখেচ্ছা! তাহার বোধ হইল তাঁহার জন্য হাসিতে হাসিতে সে নিজের প্রাণটাও দিতে পারে।

মালতী বলিল, প্রাণাধিক তুমি—তোমার একগাছি কেশের জন্য মরিতে পারি, তুমি আমার জন্য কলঙ্কিত হইবে? শুধু আমার জন্য পাঁচজনে পাঁচকথা বলিবে—তাহা তুমি সহিবে? আমি অজ্ঞাতকুলশীলা, কেহ আমাকে জানে না, কেহ আমাকে চিনে না—আমার লজ্জা নাই, কিন্তু তুমি মহৎ—তোমার কলঙ্ক, তোমার লজ্জার কথা জগৎসুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িবে। লোকে বলিবে, তুমি বেশ্যা বিবাহ করিয়াছ, সমাজে তুমি হীন হইবে, মর্মপীড়া অনুভব করিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। ঘাড় নাড়িয়া মালতী কহিল, তাহা হইবে না। এ বিবাহ কিছুতেই ঘটিতে দিব না।

মালতী স্থির হইয়া উঠিয়া বসিল, অশ্রু মুছিয়া যুক্তকরে কহিল, ঠাকুর, তুমি জান, এ জীবনে যত পাপ, যত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু সেদিনে ভুলিও না। জগতে আমার আর স্থান নাই, কিন্তু যদি—কখন সেদিন হয়, যদি কখন স্বামিস্নেহ হারাইতে হয়—সেদিন তুমি আমাকে লইও—পতিতা হইলেও চরণে স্থান দিও।

সেরাত্রের মত মালতী সেইখানেই পড়িয়া রহিল। পরদিন হইল, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আসিলেন না। সমস্তদিন মালতী পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল। অনেক রাত্রে সুরেন্দ্রনাথ আসিলেন, তাঁহার মুখ অপেক্ষাকৃত মলিন ও ক্লিষ্ট দেখিয়া মালতী, কিছু শঙ্কিতা হইল। কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, মালতী, সারাদিন বুঝি পথ চেয়ে আছ?

রঞ্জিতমুখে মালতী নিরুত্তর রহিল।

কি করি বল? একদিনের জন্যও মকদ্দমা মেটে না। যার যত আছে, কষ্টও তার ততখানি আছে।

মালতী বলিল, মকদ্দমা কর কেন?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিলেন, করি কেন? তা পরে বুঝিবে! আগে আমার হও—সমস্ত বিষয় নিজের মনে করিতে শেখ, তার পর বুঝিবে মকদ্দমা করি কেন?

মালতী মৌন হইয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, মালতী, সে কথা ভাবিয়াছিলে?

মা। কোন্ কথা?

সু। কোন্ কথা! কালিকার কথা আজই ভুলিয়া গেলে?

মা। ভুলি নাই, মনে আছে।

সু। তা ত থাকিবেই, কিন্তু ভাবিয়া দেখিয়াছিলে কি?

মা। দেখিয়াছি। বিবাহ কিছুতেই হয় না।

সু। হয় না? সে আবার কি?

মা। সেকথা ত পূর্বেই বলিয়াছি।

সু। বলিয়াছ আমার মাথা আর মুণ্ড। বিবাহ আমি করিবই।

মা। আমি হইতে দিব না। একমাসের উপর হইল এখানে আসিয়াছি; যদি এতই মনে ছিল তবে পূর্বে করিলে না কেন? এখন সবাই জানিয়াছে তুমি মৃত জয়াবতীর স্থানে আর একজনকে কলিকাতা হইতে আনিয়াছ।

সুরেন্দ্রনাথ একটু অন্যমনস্ক হইলেন—বলিলেন, আমিও তা ভাবিতেছিলাম, হোক গে—আমি—

মা। তাহা হইলে আমি বিষ খাইব।

সুরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, সেকথা পরে বোঝা যাইবে। আপাততঃ এখন সাতদিনের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন করিব।

মা। তবে সাতদিনের মধ্যেই আমাকে আর দেখিতে পাইবে না।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, কোথায় যাইবে?

মা। যেখানে ইচ্ছা।

সু। মরিবে?

মা। মরিব না—কেন না মরিতে আমি পারিব না। তবে যেপথে ভাসিয়াছিলাম আবার সেই পথেই ভাসিয়া যাব।

সু। তবু বন্ধন পরিবে না?

মা। না।

সেরূপ দৃঢ় স্বর শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, মালতী মিথ্যা কহিতেছে না, একটু চিন্তা করিলেন, পরে শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি করিবে? ইহা তোমাদের স্বধর্ম! ভাল, তাই হউক।

মালতী এবার আর কোন উত্তর দিল না। মৌনমুখে এ তিরস্কার সহ্য করিয়া রহিল। বহুক্ষণ ধরিয়া কেহ কোন কথা কহিল না। পরে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, বাড়িতে টাকা পাঠাইয়াছিলে?

মালতী তখন কাঁদিতেছিল—মাথা নাড়িয়া জানাইল যে পাঠান হয় নাই।

সু। কেন পাঠাও নাই?

মালতী মৌন হইয়া রহিল। এবার তিনি বুঝিলেন যে মালতী কাঁদিতেছে। বলিলেন, হাতে টাকা ছিল না?

মা। না।

সু। কিছুই ছিল না?

মা। না।

সু। এতদিন আসিয়াছ, হাতে কিছুই হয় নাই?]

মালতী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না। সুরেন্দ্রনাথ এ প্রশ্ন বৃথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কারণ তিনি নিজেই বেশ জানিতেন যে তাহার নিকট কিছুই নাই। কিছুক্ষণ পরে হাত ধরিয়া নিকটে আনিলেন, পার্শ্বে বসাইয়া স্নেহার্দ্র-স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, সাধ করিয়া এমন লক্ষ্মীছাড়া হইয়া থাকিলে আমি কি করিব বল? একখানা কাপড় পরিবে না, একটা অলঙ্কার অঙ্গে তুলিবে না, কি প্রয়োজন, কি ভালবাস, তা কখন মুখ ফুটিয়া বলিবে না—আমি আর কি করিব বল? তাহার পর পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া বলিলেন, রাখিয়া দাও। ইহা হইতে যাহা ইচ্ছা পাঠাইয়া দিও—বাকি যাহা রইল, স্বচ্ছন্দে ব্যয় করিয়ো, আর মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু চাহিয়া লইয়ো; অল্প হাসিয়া বলিলেন, টাকা জমাইতে শিক্ষা কর।

মালতী চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

সু। ভুলিয়ো না—আজ টাকা পাঠাইয়া দিও।

মা। কেমন করিয়া দিব?

সু। রেজেস্ট্রি করিয়া দিও।

মা। আমি পারিব না। তুমি আর কারো নাম করিয়া পাঠাইয়া দাও।

সু। কেন? ধরা পড়িবার ভয় হয়?

মা। হয়।

সু। তবে আমার উকিল অঘোরবাবুকে বলিয়া দিই। তিনি কলিকাতায় থাকেন, সেখান হইতেই পাঠাইয়া দেবেন।

মা। সেই ভাল! কিন্তু যদি কেহ তাঁহার নিকট সন্ধান লইতে আসে—তা হইলে?

সু। যেমন বুঝিবেন সেইরূপ উত্তর দিবেন।

মা। না। তাঁহাকে বারণ করিয়া দিও যেন কোনরূপে তিনি তোমার নাম না প্রকাশ করেন।

সু। আচ্ছা, তাহাই হইবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জয়াবতী মরিয়াছে, কিন্তু তাহার মা বাঁচিয়া আছে। নারায়ণপুরের কিছু উত্তরে বাসপুর গ্রামে জয়াবতীদের বাটী। সেইখানে জয়া ও তাহার জননী থাকিত। কেমন করিয়া যে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত তাহা তাহারাই জানিত। আর শুনিতে পাই গ্রামের দুই-চারিজন মন্দ লোকও তাহা জানে, কিন্তু আমাদিগের তাহা জানিয়া কোন লাভও নাই, শুনিতে বাসনাও নাই। যাউক সে কথা। এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইল, তাহার পর জানি না কি উপায়ে জয়াবতী নারায়ণপুরের জমিদারবাবুর নিজ ভবনের একাংশে স্থান পাইল। যখন সে পাইল তখন তাহার মাতাও আসিল; তখন দুইজনে ঘরকন্না পাতাইয়া দিল; কিন্তু জয়ার মার অদৃষ্ট ভাল ছিল না, তাই মাসপাঁচেক যাইতে না যাইতেই মাতা কন্যার কলহ হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে এরূপ হইল যে, দু জনে দুসন্ধ্যা রীতিমত চিৎকার করতঃ উভয়ে উভয়ের মঙ্গল-কামনা এবং আশু সংসার-বন্ধন মুক্ত হইবার বিশেষ প্রার্থনা না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। এরূপেও দিন কাটিতে লাগিল, আরো ছয় মাস কাটিল। তাহার পর জয়ার মা প্রাসাদ-বাস-লালসা পরিত্যাগ করিয়া তাহার পরিত্যক্ত পুরাতন ভবনে চলিয়া গেল। বোধ হয় তাহাকে সেখানে যাইতে নিতান্ত বাধ্য করা হইয়াছিল, কেননা যাইবার কালীন সে যেরূপ নির্ম্মমভাবে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে এবং কন্যা ও তাহার—কল্যাণ-ভিক্ষা করিতে করিতে গিয়াছিল তাহা দেখিলে কিছুতেই বোধ হয় না যে, ইচ্ছাসুখে সে এ আবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। সেই অবধি সুরেন্দ্রবাবুর নিষেধ ছিল যেন সে মাগী কিছুতেই আর এবাড়িতে না ঢুকিতে পায়। কিন্তু তাহা হইত না। সে মাগী আবার আসিত, আবার প্রবেশ করিত। কিন্তু ফল কিছুই হইত না। বহুবিধ গালিগালাজ, শাপশাপান্ত, অশ্রুপাত, বুকে দারুণ চপেটাঘাত, মস্তকের কেশোৎপাটন এবং

পরিশেষে ভৃত্যহস্তের 'অর্ধচন্দ্র', এই লইয়া জয়ার মাকে বাসপুরে ফিরিয়া যাইতে হইত। প্রতি দুইমাস-একমাস ব্যবধানে ইহা নিশ্চয় ঘটিত। বোধ হয় ইহাতে তাহার ভিতরে ভিতরে কিছু লাভ ছিল, না হইলে শুধু এইগুলির জন্যই সে অত পরিশ্রম করিয়া এতদূরে আসিত না; সে যেরূপ চরিত্রের লোক ছিল তাহাতে এগুলি আর কোথায় অনেক কম ক্লেশে উপার্জন করিয়া লইতে পারিত। যাক একথা—এমনও হইতে পারে যে, সে কন্যারত্নকে অতিশয় স্নেহ করিত, এইজন্য বিপথগামিনী হইলেও মায়া কাটাইতে পারিত না—দেখিতে আসিত। এইরূপে চলিত। তাহার পর যখন সে শুনিল যে, জয়াবতী গঙ্গায় ডুবিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে তখন চিৎকার শব্দে বাসপুরের অর্ধেক প্রতিবাসীকে আপনার বাটীর সম্মুখে একত্র করিয়া ফেলিল।

বাসপুরে অধিকাংশই ছোটলোকের বাস, সেজন্য অধিকাংশ চাষাভুষা লোকের বাটীস্থ বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, আধবয়সী, যুবতী প্রভৃতি দর্শকবৃন্দে জয়ার মার দাওয়া দেখিতে দেখিতে ভরিয়া গেল। তখন সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে, বাক্ শক্তিহীন হইয়া এ কাহিনী শুনিল যে, জয়াবতীর গ্রামজোড়া জাহাজখানা প্রায় পাঁচশত দাসদাসীর সহিত কলিকাতার অতল জলতলে মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

তখন জয়ার মা বলিল, যারা দেখেচে, তারা বলচে যে অত বড় জাহাজ কলকাতা শহরে নেই।

একজন বৃদ্ধা প্রত্যুত্তরে বলিল, তা ত নেই-ই।

একজন আধবয়সী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, কত দাম ছিল?

আর বাছা দামের কি আর নেখা-জোখা আছে?

সে চুপ করিল।

জয়ার মা কহিল, নিজে লাটসাহেব পর্যন্ত দেখতে এসেছিল।

যুবতীরা কান খাড়া করিয়া উঠিয়া বসিল।

নিজে লাটসাহেব পর্যন্ত কেঁদে সারা—বাছাকে সবাই ভালবাসত কিনা!

এইখানে জয়ার মা চোখের কোণে অঞ্চলটা রগড়াইয়া লইল। আর শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই মনে মনে প্রার্থনা করিল যে, কি সুকৃতি-বলে পরজন্মে জয়াবতীরূপে জন্মগ্রহণ করা যায়।

জয়ার রূপের কি আদি-অন্ত ছিল? সাক্ষেৎ দুর্গা-প্রতিমে—আহা; কিবা নাক, কিবা চক্ষু, কি ভুরুর ছিরি, কি গড়ন-পেটন, কোনখানে একতিল খুঁত ছিল কি?

যুবতীরা চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, এমন কি দুইজন আধবয়সীও স্বীকার করিল যে ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

বাবু কি কম ভালবাসতেন? যখন যা বলেচে তখনই তাই পেয়েচে। অত বড় রাজাতুল্য লোকের নজরে পড়া কি সোজা কথা!

একথা মনে মনে প্রায় সকলেই স্বীকার করিল।

আমিও আর বেশিদিন বাঁচব না—এ শোক কি বরদাস্ত হবে?

ইহাতে কাহারও হয়ত সন্দেহ ছিল, কিন্তু সহানুভূতি প্রকাশ করিতে কেহ ছাড়িল না।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারবাবুর কি হল?

তিনি ভাল আছেন; আলাদা জাহাজে ছিলেন কিনা তাই রক্ষা পেয়েচেন।

দুজনে কি তবে আলাদা জাহাজে ছিল?

তা ছিল বৈ কি, না হলে কুলুবে কেন? লোকজন ত সঙ্গে কম যায়নি!

তাদের কি হল?

আহা! সবাই ডুবেচে।

সে বেলাটা এমনই কাটিল। 'সন্ধ্যা হয়, ঘরকন্নার কাজ পড়ে আছে' বলিয়া 'কি আর কোরবে বল? তবে এখন আসি', সকলেই একে একে প্রস্থান করিল। জয়ার মাও একটা যা-তা করিয়া সিদ্ধ পাক করিয়া লইয়া সকাল সকাল

দ্বার বন্ধ করিল, আর যতক্ষণ নিদ্রা না আসিল ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে চিৎকার করিয়া প্রতিবাসিনীগণের অন্তঃকরণে সেই গ্রামজোড়া জাহাজ আর লাটসাহেবের কান্নার কথা জাগাইয়া দিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকাল হইবামাত্রই জয়ার মা নারায়ণপুর অভিমুখে রওনা হইয়া পড়িল। ক্রমে সে নারায়ণপুরে প্রবেশ করিল। সেই পথ, সেই ঘাট, সেই বৃক্ষের শ্রেণী, সেইসব—সমস্ত পরিচিত। জয়ার মার মনে পড়িল যে, এই পথ দিয়াই সে চলিত, আবার এই পথ দিয়াই বক্ষে আঘাত করিতে করিতে ফিরিয়া আসিত। আর সে নাই, তেমন ঝগড়া আর কখন হইবে না, তেমন করিয়া বুক পিটিতেও আর পাইবে না। শত বেদনায় তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল; সহস্রগুণ চিৎকারে তাহা শমিত করিতে করিতে জয়ার মা চলিল। যাহার বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল, তাহাকে শতকর্ম ফেলিয়াও অন্ততঃ একবার জানালার নিকট আসিতে হইল। ক্রমে সুরেন্দ্রবাবুর অট্টালিকা ঐ সম্মুখে! জয়ার কত স্মৃতি তাহাতে মাখান আছে; জয়ার মা আকুলভাবে ক্রন্দনের তোড় আরো সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। সম্মুখের গেট দিয়া পূর্বে সে ঢুকিতে পাইত না; কারণ বাবুর নিষেধ ছিল, কিন্তু এখন সে যেরূপ ব্যাঘ্রিনীর ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিয়া পড়িল যে, দ্বারবানদিগের বাধা দিতে কিছুতেই সাহস হইল না। সকলেই প্রায় দশহস্ত পিছাইয়া দাঁড়াইল।

সুরেন্দ্রবাবু তখন আহারান্তে বিশ্রাম করিবার প্রয়াস করিতেছিলেন, চিৎকার শব্দে বুঝিলেন জয়ার মা ঝড়ের মত আসিয়া পড়িল। আসিয়াই সে জয়াবতীকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য অন্ধভাবে এক আবেদন করিয়া নিকটেই উপবেশন করিল, তাহার পর আর এক আবেদন, আর এক আবেদন, কথা শেষ না হইতেই পুনঃপুনঃ শতসহস্র আবেদন, ভিক্ষা প্রার্থনা, কৈফিয়ৎ, তলব ইত্যাদি—নানাপ্রকারে সুরেন্দ্রনাথকে একবারে বিহ্বল করিয়া ফেলিল;

তৎপশ্চাদ্বর্তী মস্তক ঠোকন, দারুণ বক্ষাঘাত ও সমুষ্টি কেশাকর্ষণ প্রভৃতি আর যাহা ঘটিল তাহা সম্যক বিস্তারিত বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

সর্বশেষে জয়ায় মা এই বলিয়া শেষ করিল যে, তাহার আর একটি পয়সাও খাইতে নাই, এবং দয়া না করিলে হয় সে অনাহারে মরিবে, নাহয় এইখানে গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহার জয়াবতী যেখানে গিয়াছে সেইখানেই যাইবে।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, যা হইবার হইয়াছে, এখন কি হইলে তোমার চলে?

জয়ার মা চক্ষু মুছিয়া বলিল, বাবা, আমার সামান্যতেই চলিবে—আমি বিধবা, কেউ নাই—কত আর আমার লাগিবে?

সু। তবু কত টাকা চাও?

জ-মা। পনের টাকা মাসে পেলেই আমার চলে।

সু। তাই পাইবে। যতদিন বাঁচিবে, মাসে মাসে কাছারি হইতে ঐ টাকা লইয়া যাইয়ো।

তখন জয়ার মা অনেক আশীর্বাদ করিল, অনেক প্রীতিপ্রদ কথা কহিল, তাহার পর প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সে আর তেমন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেল না, বরং আরো অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে গেল। জয়াবতী মরিয়াছে, মা হইয়া সে অন্তঃকরণে ক্লেশ অনুভব করিয়াছে, কিন্তু কিছু সুবিধাও হইয়াছে, যাইবার সময় জয়ার মা একথা মনে করিতে ভুলিল না।

জয়ার মা সুরেন্দ্রবাবুর নিকট বিদায় লইয়া একেবারে চলিয়া গেল না। যেস্থানে দাসদাসীরা থাকে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় পরিচিত দাসদাসী অনেকেই ছিল, জয়ার মার দুঃখে তাহাদের মধ্যে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিল, দুই-একজন কাঁদিয়া ফেলিল। জয়ার মা অনেক গল্প করিল, সুরেন্দ্রবাবুর দয়ার কথাও প্রকাশ করিল; কিন্তু কথায় কথায় ক্রমশঃ যখন সে শুনিল যে, তাহার জয়াবতীর স্থানে আর একজন সদ্য অভিসিক্ত হইয়া আসিয়াছে, এবং বাবু তাহাকে বহু সমাদরে বাগানবাটীতে স্থান দিয়াছেন, তখন জয়ার মা অন্য আকৃতি

ধারণ করিল। চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল; স্থান কাল বিবেচনাহীন হইয়া সেইখানেই বাগানবাটী-অধিকারিণীর উদ্দেশে বহুবিদ হীনবাক্য গালিগালাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ক্রন্দনের ধ্বনি ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; অদম্য উৎসাহে নবীন করিয়া পুনরায় সেই কেশাকর্ষণ, সেই বুক-চাপড়ানি। দাসদাসীরা ভীত হইল, শান্ত হইবার জন্য অনেক বুঝাইল, শেষে বাবুর ভয় পর্যন্ত দেখাইল, রাগ করিয়া বাবু টাকা বন্ধ করিয়া দিবেন তাহাও বলিল, কিন্তু জয়ার মা বহুক্ষণাবধি তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। পরিশেষে তাহারা বাধ্য হইয়া অন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া জয়ার মার হস্ত হইতে বহু ক্লেশে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

পথে আসিয়া জয়ার মা বাগানবাটী অভিমুখে চলিল। কন্যাশোক তাহার চতুর্গুণ উথলিয়া উঠিয়াছে, হিংসানল পঞ্জরে পঞ্জরে অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার কন্যাকে এ মাগী ডুবাইয়া দিয়া বলপূর্বক সে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। গর্জাইতে গর্জাইতে তখন জয়ার মা বাগানবাটীতে প্রবেশ করিল। যে দাসী সম্মুখে পড়িল তাহার পানে ক্রোধকষায়িত নয়নে চাহিয়া বলিল, সে ডাইনী কোথা?

সে বেচারী নূতন লোক, ভয়ে ভয়ে পিছাইয়া বলিল, ঐ হোথা।

সে যেমন প্রশ্ন করিয়াছিল, তেমনি উত্তর পাইল। সেও প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারে নাই, জয়ার মাও উত্তরের অর্থ বুঝিতে পারিল না। আর একবার তাহার পানে সেইরূপ চাহিয়া বলিল, কোথা?

সে অঙ্গুলি হেলাইয়া যথেচ্ছা একটা দিক দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। জয়ার মা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। সেখানে কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু এ কি শোভা! কি আসবাব, কি বহুমূল্য সাজসজ্জা! সে পূর্বে সুরেন্দ্রবাবুর বাটীতে অনেকদিন ছিল, সেখানে বহু দ্রব্য দেখিয়াছে, কিন্তু এমন কখনও দেখে নাই। যত দেখিতে লাগিল, তত ক্রুদ্ধ সর্পের মত ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এ সকল

সমস্তই জয়াবতীর হইত, আর কে জানে—হয়ত কোন সময়ে তাহারই বা হইতে পারিত না? এইরূপে মনে মনে তর্কবিতর্ক করিতে করিতে সে একটা কক্ষে একজন স্ত্রীলোকের দেখা পাইল। পশ্চাৎ হইতে তাহাকে দেখিয়া জয়ার মা একজন পরিচারিকা স্থির করিল। ডাকিয়া কহিল, ওগো, তোদের গিন্নী কোথায়? অস্বাভাবিক কর্কশবচনে সে ফিরিয়া চাহিল। জয়ার মা দেখিল তাহার সামান্য বস্ত্র, গাত্রে অলঙ্কারের নামমাত্র নাই—কিন্তু মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, কর্কশ কণ্ঠস্বর নরম হইয়া আসিল; বলিল, তুমি কে গা?

আমি এইখানে থাকি। আপনি বসুন।

জয়ার মা। তুমি কতদিন আসিয়াছ?

স্ত্রীলোক। প্রায় একমাসের কিছু অধিক।

জয়ার মা। তোমাদের গিন্নী কোথায়? তুমি বুঝি তারি সঙ্গে এসেচ?

স্ত্রীলোকটা মাথা নাড়িয়া বলিল, তাঁর সঙ্গে কিছু প্রয়োজন আছে কি?

প্রয়োজন আমার ঢের আছে। সেই ডাইনী হারামজাদীর মুণ্ডুটা আজ চিবিয়ে খাব। বলিতে বলিতে তাহার সেই পূর্বভাব, সেই রুক্ষ মুখশ্রী, সেই অমানুষিক চোখের ভাব সমস্তই ফিরিয়া আসিল—জানিস আমি কে? আমি জয়ার মা, আমাকে দেশসুদ্ধ লোক চেনে। হারামজাদী ডাইনী আমার মেয়েকে খেয়েচে—আজ আমি তাকে খাব—খাব—খাব (দন্তে দন্ত ঘর্ষণ) খাব, তবে যাব, খাব—খাব—খাব—সব শেষ কোরে তবে যাব।

স্ত্রীলোকটি রুদ্ধশ্বাসে সে অলৌকিক ভঙ্গি দেখিতে লাগিল।

ওরে হারামজাদী তোকে খাব (বক্ষে চপেটাঘাত)—ওরে আবাগী—শতেক খোয়ারি—ছেনাল—ডাইনী (মস্তকের কেশাকর্ষণ) তোকে খাব—তোকে খাব—তোকে খাব—মা-কালীর পায়ে বুক চিরে রক্ত দেব—আর এমনি কোরে মাথা খুঁড়ে হাড় দেব (ভূমিতলে মস্তক ঠোকন)—ওরে আবাগী, এমনি কোরে—এমনি কোরে (দন্তে দন্ত ঘর্ষণ)— কই, কোথা সে?

যাহার উদ্দেশে এত হইতেছিল, সেই সুমুখে বসিয়াছিল; জয়ার মা কিন্তু তাহা জানিত না, জানিলে বোধহয় সেদিন কিছু একটা ঘটিয়া যাইত।

মালতী নিকটে আসিয়া হাত ধরিল, ধীরে ধীরে বলিল, আপনি চুপ করুন—

আমি চুপ কোরব! তুই হতভাগী সেকথা বলবার কে? আমার মেয়েকে খেয়েচে, আর আমি চুপ কোরে থাকব? (পুনরায় ভূমিতলে মস্তকাঘাত)

মালতী বুঝিল, অত মোটা কার্পেট না থাকিলে জয়ার মা সেদিন আস্ত মাথা লইয়া বাটী ফিরিয়া যাইতে পারিত না। কহিল, তিনি আজ এখানে নাই।

এখানে নাই?

মা। না।

জয়ার মা। আমি কিন্তু এক পাও এখান থেকে নোড়ব না—হারামজাদীকে দেখব, খাব—তবে যাব!

মালতী অল্প হাসিয়া বলিল, যাবেন কেন? স্বচ্ছন্দে এখানে থাকুন। কিন্তু অনেক বেলা হল, খাওয়া-দাওয়া ত এখনও আপনার হয় নাই?

জয়ার মা। খাওয়া-দাওয়া? তা তখন একেবারেই কোরব।

মা। আহা, মেয়ের শোক! মার প্রাণ যে কি কোরচে তা আমিই জানি।

জয়ার মা ঈষৎ নরম হইল, বলিল, তাই বুঝে দেখ বাছা!

মা। তা কি আর বুঝিনে! কিন্তু কি করবেন বলুন—মুখেও ত কিছু দুটো দিতে হয়, পোড়া পেট ত আর মানে না।

জয়ার মা। তা সত্যি কথা।

মা। তাই বলচি, এখানেই দুটো জোগাড় করে দিই—

জয়ার মা। দিবি? তা দে বাছা।

মা। আহা! জয়াদিদি আপনার কথা কত বোলতেন।

জয়ার মা। বোলত? তা বলবে বৈ কি! তুই তাকে দেকেচিস!

মা। আহা—কতদিন একসঙ্গে এলাম—তাঁকে আর দেখিনি?

জয়ার মা। তুই বুঝি তার সঙ্গে ছিলি?

মা। হাঁ, তিনি আমাকে আমার দেশ থেকে তুলে নিয়েছিলেন।কত কথা বোলতেন—তার মধ্যে আপনার কথাই বেশি হোত।

জয়ার মা। তা হবে বৈ কি! সে আমার তেমন মেয়ে ছিল না।

মা। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন।

জয়ার মা। আহা, অমন মেয়েও মরে! কিন্তু তোদের এ ডাইনী কোত্থেকে উঠল?

মা। কলকাতা থেকে।

জয়ার মা। মাগী বুঝি বাবুকে ওষুধ করেচে?

মা। শুনতে ত পাই।

জয়ার মা। কিন্তু আমি তার ওষুধ করা আজ ভেঙ্গে দেব।

মা। দিও—মাগী যেমন—তেমনি শোধ দিয়ে তবে যেয়ো।

জয়ার মা। তা যাব। মাগী মন্তর-তন্তর কিছু জানে?

মা। মন্তর-তন্তর? শুনতে পাই কামিখ্যে থেকে শিখে এসেছিল। মানুষকে ভেড়া কোরে রাখতে পারে। এই বাবুকে এমনি করেচে যে, ইনি উঠতে বললে ওঠেন, বসতে বললে বসেন।

জয়ার মার মুখখানা কিছু বিবর্ণ হইয়া গেল। শুষ্কমুখে বলিল, তা মন্তর-তন্তর আমিও জানি।

মা। জানবে না কেন? তা আজ দুপুরবেলা যখন আসবে তখন দেখিয়ে দেব।

জয়ার মা। বাণ মারতে জানে?

মা। জানে বৈ কি!

জয়ার মা। কখন আসবে?

মা। দুপুরবেলা।

জয়ার মা জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল। বোধ হইল যেন দুপুর হইতে অধিক বিলম্ব নাই। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আজ কিন্তু আমার ঢের বরাত আছে—আজ তবে এখন যাই, কাল আসব। জয়ার মা উঠিয়া দাঁড়াইল।

মা। না, না, আজ এখানে খেয়ে-দেয়ে যান।

জয়ার মা।বড় দেরি হবে যে।

মা। কিছুই দেরি হবে না!

জয়ার মা। তবে শীগ্‌গির শীগ্‌গির নে মা। তোর নামটি কি বাছা?

মা। আমার নাম মালতী।

জয়ার মা। আহা বেশ নাম।

জয়ার মা তখন নীচে আসিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কিছু আহার করিয়া লইল। মালতী নিকটে বসিয়া দেখিল যে, জয়ার মার আহারে তেমন সুবিধা হইল না, উঠিয়া বলিল, তবে এখন যাই মা।

মা। একটা কথা আপনাকে এখনো বলা হয়নি—জয়াদিদির কাছে আমি দশ টাকা ধার নিয়েছিলাম—তা তিনি ত নেই, এখন আপনি যদি দয়া করে আমাকে ঋণমুক্ত করেন।

জয়ার মা ভাল বুঝিতে পারিল না। বলিল, কি করি?

মা। সেই দশ টাকা আপনি নিন।

জয়ার মা। আমাকে তুমি দেবে?

মা। হাঁ।

মালতী উপর হইতে দশ টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিল।

জয়ার মা অনেকক্ষণ ধরিয়া মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, বাছা, তুই নিশ্চয় ভদ্দরঘরের মেয়ে।

মালতী মৃদু হাসিয়া বলিল, আমি দুঃখী লোক।

জয়ার মার চোখের কোণে একটু জল আসিল। বলিল, তা হোক—তবুও তুই ভদ্দরের মেয়ে না হলে—এই দেখ্ না কেন—তা সত্যি কথাই বলি, আমার জয়ার হাতে এত টাকা ছিল, কিন্তু মা বলে দশ টাকা কখন একসঙ্গে এমন করে হাতে তুলে দেয়নি। জয়ার মা চোখের কোণ মুছিল।

মা। আমরা দুঃখী লোক, কিন্তু ধর্ম ত আছেন।

জয়ার মা। আছেন; কিন্তু সবাই কি তা জানে?

মা। তা হোক—কাল তবে আসবে?

জয়ার মা। হ্যাঁ—তা—হ্যাঁ আসব বৈ কি।

মা। আমাদের ঠাকরুনকে তোমার কথা আজ তবে বলে রাখব কি?

জয়ার মা। হ্যাঁ—তা—না তা আর বলে কাজ নেই।

কামরূপ হইতে শিক্ষা করা 'বাণমারা' বিদ্যাটা জয়ার জননীর মনে বড় শান্তি দিতেছিল না, মালতী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

জয়ার মা শুষ্ক হইয়া বলিল, তবে এখন আসি, মাঝে মাঝে তোর কাছে আসব এখন।

মা। এসো!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

একথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ খুব হাসিয়া বলিলেন, তবে তোমার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়ে গেল?

মালতী বলিল, ঝগড়া হবে কেন, বরং বেশ ভাব হয়ে গেল।

সু। তবে ভাব করে নিয়েচ?

মা। নিয়েচি।

সু। কিন্তু ওর নিজের মেয়ের সঙ্গে কখন বনতো না। চিরকাল ঝগড়া ছিল।

মা। তা শুনেচি।

সু। কি করে?

মা। নিজেই মনের দুঃখে আমাকে কিছু কিছু বলেচে।

মনদুঃখের কারণটা কিন্তু মালতী খুলিয়া বলিল না।

সু। প্রথমে বাড়িতে ঢুকেই বুঝি তোমাকে খুব গালাগালি দিয়েছিল?

মালতী হাসিয়া বলিল, আমাকে দেয়নি। যে ডাইনীকে তুমি কলিকাতা থেকে এনেচ তাকেই দিয়েছিল।

সু। সে ডাইনী ত তুমিই।

মা। আমি কেন হব? আমি ত কলিকাতা থেকে আসিনি।

সু। তা হোক, তবু ত তুমিই সে।

মা। আমাকে সে চিনিতেও পারেনি। একটা দাসী মনে করেছিল।

সুরেন্দ্র ঈষৎ দুঃখিতভাবে বলিলেন, তা ছাড়া অপরে আর কি মনে করতে পারে?

মা। আমিও সেই জন্যে আজ বেঁচেচি—না হলে বোধহয় আমাকে আস্ত রাখত না।

সু। মেরে ফেলত?

মা। বোধ হয়।

সু। তার পর?

মা। আমি বললাম, সে মাগী এখানে নেই। তাতে বললে যে, সে এলেই তাকে খেয়ে ফেলবে।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিতে লাগিলেন।

তার পর জিজ্ঞাসা করলে, তোমাকে ওষুধ করেচে কি না; আমি বললাম, বোধ হয় করেচে, না হলে বাবু উঠতে বললে ওঠেন, বসতে বললে বসেন কেন?

সু। আমি বুঝি তাই করি?

মা। কর না কি?

সু। আচ্ছা তা দেখচি; তার পর?

তার পর জিজ্ঞাসা করলে যে, সে মন্তর-তন্তর জানে কিনা, আমি বললাম, খুব জানে; কামরূপ থেকে শুনতে পাই শিখে এসেচে। বললে, আমিও জানি, কিন্তু বুঝতে পারলাম মনে মনে ভয় পেয়েচে।জিজ্ঞাসা করলে, বাণ মারতে পারে? আমি বললাম, পারে।

সুরেন্দ্রবাবু এবার খুব জোরে হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তখন বুঝি পালিয়ে গেল?

মা। হাঁ।

সু। আর কখন এখানে আসবে না?

মা। আসবে বৈকি। কিন্তু তোমার সে ডাইনীর কাছে আসবে না—আসে ত আমার কাছে আসবে।

সু। যার কাছে ইচ্ছা আসুক, কিন্তু এখন তুমি আমার কাছে এস। কাছে আসিলে হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন, মালতী, আর কতদিন এমন করে কাটাবে? এমনধারা বেশ চোখে আর দেখা যায় না।

মালতী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, গয়না পরিলে কি রূপ বাড়িবে?

সু। তোমার রূপের সীমা নাই—যার সীমা নাই তাকে বাড়ান যায় না। কিন্তু আমার তৃপ্তির জন্যেও অন্ততঃ—

মা। গয়না পরিতে হবে?

সু। হাঁ।

মা। পরিতে পারি, কিন্তু আগে বল আমাকে গহনা পরাতে তোমার এত জেদ কেন?

সু। যদি বলি, তা হলে মনে দুঃখ পাবে না?

মা। কিছু না!

সু। তবে বলি শোন। তোমার এ নিরাভরণা মূর্তি বড় জ্যোতির্ময়ী—স্পর্শ করিতেও সময়ে সময়ে কি যেন একটা সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে—দেখিলেই মনে হয় যেন আমার পাপগুলা ঠিক তোমারি মত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। তোমাকে বলতে কি—তোমার কাছে বসিয়া থাকি, কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত ভয় আমাকে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতেছে না বলিয়া মনে হয়। আমি তেমন সুখ পাই না—তেমন মিশিতে পারি না; তাই তোমাকে অলঙ্কার পরাইয়া একটু ম্লান করিয়া লইব।

মালতী নিঃশব্দে আপনার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিল, প্রকাণ্ড দর্পণে তাহা পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাও দেখিল। মনে হইল সে বুঝি যথার্থ-ই বড় উজ্জ্বল, বড় জ্যোতির্ময়ী; মনে হইল পুণ্যের অতীত-স্মৃতি এখনও বুঝি সে-দেহ ছাড়িয়া যায় নাই, পবিত্রতার ছায়াখানি এখনও সে-দেহে বুঝি ঈষৎ লাগিয়া আছে। রাত্রে,

সহসা নিস্তব্ধ কক্ষে মালতীর ঈষৎ ভ্রম জন্মিল—সে দেখিল, সম্মুখে মুকুরে এক কলঙ্কিত দেবীমূর্তি, আর পার্শ্বে জীবনের আরাধ্য সুরেন্দ্রনাথের অকলঙ্ক দেবমূর্তি।

বিস্ময়ে, আনন্দে মালতী চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পরদিন ঠিক সন্ধ্যার পর সুরেন্দ্রনাথ মোহন নটবরবেশে মালতীর মন্দিরে দেখা দিলেন। গলায় মোটা মোটা ফুলের গোড়ে; জুঁই, বেলা, বকুল, কামিনী প্রভৃতি পুষ্পের একরাশি মালা কণ্ঠ ও বুক ভরিয়া আছে, একহস্তে ফুলের তোড়া, অপর হস্তে মখমল-মণ্ডিত সুন্দর সুগঠন একটা বাক্স; পরিধানে পট্টবস্ত্র, পায়ে জরির জুতা, হেলিতে দুলিতে একেবারে মালতীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মালতী হাসিয়া বলিল, আজ আবার এ কি?

সু। কি বল দেখি?

মা। তা জানি না।

সুরেন্দ্রনাথ কৃত্রিম গম্ভীর হইয়া বলিলেন, তুমি পূজা কর?

মা। করি।

সু। তবে তোমার বাড়িতে চন্দন আছে; চন্দন এনে আমাকে সাজিয়ে দাও—আজ আমার বিবাহ!

মা। কার সঙ্গে?

সু। আগে সাজাও, তার পরে শুনিও।

মালতী নীচে হইতে চন্দন ঘষিয়া আনিয়া বেশ করিয়া সাজাইয়া বলিল, এখন বল!

সু। তা কি এখনো বুঝিতে পারনি!

তাহার পর গলদেশ হইতে পুষ্পমালা খুলিয়া একটির পর একটি করিয়া তাহাকে পরাইলেন, মখমল-বাক্স হইতে নানাবিধ রত্নজড়িত অলঙ্কার বাহির করিয়া যথাস্থানে যথাক্রমে নিবেশ করিলেন—মালতী জন্মে কখন সেইরূপ দেখেন নাই, বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল—সব শেষ করিয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,

তোমাকে বিবাহ করিলাম, এতদিনে তুমি আমার স্ত্রী হইলে; আর কোথাও পালাতে পারবে না—যে মালা আজ পরাইলাম, জন্ম-জন্মান্তরে তা আর খুলিতে পারিবে না।

উভয়ের চক্ষেই জল আসিল, উভয়েই কিছুক্ষণ ধরিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর অশ্রু মুছাইয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, এখন বাড়ি চল—আপনার সংসার আপনি বুঝিয়া লও—আশীর্বাদ করি এ জীবনে চিরসুখী হও!

মালতী প্রণাম করিয়া পুনর্বার নিকটে উপবেশন করিল। চক্ষের জল আজ তাহার বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। শতবার মুছিল, শতবার চক্ষু তিতিয়া উঠিল—কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। সুরেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন, মালতী, আজ পিতা-মাতার কথা মনে হইতেছে?

মালতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

যাহা ইচ্ছা ছিল তাহাতে তুমি নিজেই বাদ সাধিলে। মনে করিয়াছিলাম, আর এমন করিয়া থাকিব না, তোমাকে যখন পাইয়াছি তখন প্রকাশ্যভাবে বিবাহ করিব, আর একবার সংসারী হইব। তোমার পিতা-মাতাকে এখানে আনিব—লোকে তখন যাই বলুক না কেন—আমি নিজে সুখী হইব। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সে আশা এখন দুরাশা।

এখন বাড়ি যাইবে?

মালতী বলিল, কোথায়?

যে তোমার বাড়ি—যেখানে আমি থাকি।

এটা কি আমার বাড়ি নয়?

তবে কি সেখানে যাইবে না?

না।

আমিও ঠিক তাই ভাবিয়াছিলাম।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দুঃখের দিন দেরি করিয়া কাটে সত্য, কিন্তু তথাপি কাটে, বসিয়া থাকে না। মাধবের মৃত্যুর পর শুভদার দিনও তেমনি করিয়া অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। তখন বর্ষা ছিল, আকাশে মেঘ ছিল, পথে-ঘাটে কাদা-পাঁক, পিছল ছিল—এখন তাহার পরিবর্তে শরৎকাল পড়িয়াছে। সে মেঘ নাই, সে কাদা-পাঁক, পিছল নাই—পথঘাট খটখট করিতেছে; কখন দুই-একখণ্ড শুভ্র মেঘ উদ্দেশ্যহীনভাবে আকাশ বহিয়া কোথাও চলিয়া যাইতেছে। তখন প্রকৃতির নিত্য ম্লানমুখ, নিত্য চোখে অশ্রু ছিল—এখন সেসব আর নাই। কখন কখন সেমুখ ঈষৎ মলিন হয়, দুই-একফোঁটা চোখে জলও আসে দেখিতে পাই—কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। তৎক্ষণাৎ মুছিয়া ফেলিয়া আবার হাসে। অতীতের স্মৃতি-জড়িত দুঃখের শেষ ক্রন্দনটুকুর মত, গগনের কোন অনির্দেশ্য কোণ হইতে 'গুড়গুড়' করিয়া কখনো কাঁদিয়া উঠে বটে, কিন্তু তাহাতে আর গভীরতা নাই। একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না, একথা প্রকৃতি সতীও যেন কতক বুঝিয়াছে। পরিবর্তন ভিন্ন সংসার চলে না। একথা সকলেই বুঝেন—বুঝে না কেবল শুভদার সৃষ্টিকর্তা! জন্মিয়া অবধি আজ পর্যন্ত! শুভদা একথা মনে করিয়া দেখে—আর দেখে শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী। পাড়ার পাঁচজন দেখে—শুভদা ঘাট হইতে স্নান করিয়া যাইতেছে, জলের কলসী কাঁকে লইয়া ধীর মন্থর-গমনে চলিয়া যাইতেছে, গৃহকর্ম করিতেছে—কিন্তু নিত্য ক্ষীণ, নিত্য বিষাদময়ী!

বর্ষীয়সীরা বলে, ছুঁড়ী আর বাঁচবে না—আহা!

সমবয়সিনীরা বলে, এমন অদৃষ্ট যেন শত্রুরও না হয়—আহা!

পিছনে 'আহা' 'আহা' সবাই বলে, কিন্তু সম্মুখে একথা বলিতে তাহাদের লজ্জা বোধ হয়। সকলেই যেন বুঝিতে পারে, এ 'আহা'-টা শুভদার সম্বন্ধে খাটে

না। আর একটা অন্য কিছু—যাহা জগতে নাই, যাহা এ পর্যন্ত কেহ কখন প্রয়োগ করে নাই—প্রয়োগ করিবার অবকাশও আইসে নাই—এমন একটা শব্দ খুঁজিয়া পাইলে যেন বলিবার মত কতকটা হয়। তাই কেহ কিছু বলে না—শুভদা আসিলে চুপ করিয়া থাকে। স্নান করিবার সময় গঙ্গার ঘাটে ছেলেমেয়েরা জল ছিটায়, গোলমাল করে, হাস্য-কলরবে প্রৌঢ়াদিগের শিবপূজার মন্ত্র ভুলাইয়া দেয়, এমনি অনেক উৎপাত করিতে থাকে, কিন্তু শুভদা যখন নিঃশব্দে ঘাটের সর্বশেষপ্রান্তে কলসী নামাইয়া নিতান্ত অস্পর্শীয়া নীচ জাতীয়ার ন্যায় সসঙ্কোচে জলে নামে, তখন বালক-বালিকারাও বুঝিতে পারে যে, এখন আর গোলমাল করিতে নাই, জল ছিটাইতে নাই—এখন চুপ করিয়া শান্তশিষ্ট হইয়া জননীর বা আর কাহারো আপনার লোকের অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইতে হয়। সে চলিয়া যায়, তখনও কিন্তু তাহারা পূর্বভাব শীঘ্র ফিরিয়া পায় না।

শুভদা হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে, দুঃখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। কাঁদিতে তাহার বিরক্তি বোধ হয়, সেসব পুরাতন কথা আলোচনা করিতে লজ্জা করে। বাড়িটা আজ সম্পূর্ণ নির্জন হইয়াছে; ছলনা শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, রাসমণি প্রায় সমস্তদিন বাটী আসেন না। আর হারাণ মুখুজ্যে! তা সে আজকাল ভাল ছেলে হইয়াছে। নিত্য দুবেলা বাটী আসে, দুই আনা চারি আনা পূর্বের মত কর্জ চাহিয়া লয়—আবার চলিয়া যায়। শুভদা সমস্ত দুপুরবেলাটা রান্নাঘরের মাটির মেঝের উপর আঁচল পাতিয়া পড়িয়া থাকে। সন্ধ্যা হয়—আবার ওঠে, ঘাটে যায়, প্রদীপ জ্বালে, রন্ধন করে—যত্ন করিয়া একথাল অন্ন বাড়িয়া স্বামীর জন্য রাখিয়া দেয়, সদানন্দকে আহার করায়। আবার সকাল হয়, আবার বিকাল হয়—আবার রাত্রি আইসে।

নিত্য যেমন হয় শুভদা আজও দ্বিপ্রহরের পরে রন্ধনশালায় শুইয়াছিল। বাহিরে পুরুষকণ্ঠে একজন ডাকিল, মাঠাকুরুন!

শুভদা শুনিতে পাইল কিন্তু কথা কহিল না। মনে করিল বুঝি আর কাহাকেও কেহ ডাকিতেছে।

সে আবার ডাকিল, বলি মাঠাকুরুন! কেউ বাড়ি আছেন কি?

শুভদা বাহিরে আসিয়া বলিল, কে?

আমি পিয়ন। চিঠি আছে।

শুভদা বড় বিস্মিত হইল—চিঠি কে লিখিবে? কাছে গিয়া বলিল, দাও—

অমনি পাবে না মাঠাকুরুন। এখানা রেজেস্ট্রি চিঠি—শ্রীশুভদা দেবীর নামে, তাঁর সই দিতে হবে।

শুভদা রেজেস্ট্রি অর্থ তেমন বুঝিল না—বলিল, দাও—আমারই নাম শুভদা।

পিয়ন চিঠি বাহির করিল, স্বতন্ত্র একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া কহিল,—সই দিন।

শুভদা লিখিতে জানিত—বলিল, কালি-কলম দাও।

পিয়ন মুখপানে চাহিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, কালি-কলম আমি পাব কোথায়? আপনার বাড়ি, বাড়িতে কালি-কলম নেই!

শুভদা বলিল, দেখি। তাহার পর উপর-নীচে সর্বত্র খুঁজিয়া ললনার একটা অর্ধভগ্ন দোয়াত পাইল। কালি শুকাইয়া গিয়াছে—জল দিয়া কোনরূপে একরকম করিয়া কালি প্রস্তুত হইল—কিন্তু কলম কোথায়?

হঠাৎ শুভদার মাধবের দপ্তরের কথা মনে পড়িল। উপরের ঘরে এক কোণে একটা ছোট চৌকির উপর বসিয়া মাধব ও ছলনা পাঠ অভ্যাস করিত—ললনা তাহাদের শিক্ষক ছিল।

শুভদা উপরে আসিয়া দেখিল—এককোণে সেই চৌকির উপর তেমনিভাবে একটি ছোট কালিলিপ্ত দপ্তর ক্ষুদ্র এক বস্ত্রখণ্ডে জড়িত পড়িয়া আছে। শুভদা এদিকে বহুকাল আইসে নাই, বহুকাল এদিকে চাহে নাই। এটা ললনার

ঘর; ললনা মরিয়া পর্যন্ত আজ সে প্রথম এ-ঘরে প্রবেশ করিল। দপ্তরখানি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে খুলিল—একখানি ভগ্ন শ্লেট, একখানি অর্ধেক বোধোদয়, একটা ধারাপাত, দুটো কঞ্চির কলম, একটা মুখভাঙ্গা শরের কলম, ছোট ছোট দুটি শ্লেট পেন্সিল, পুরাতন পঞ্জিকা হইতে কর্তিত গোটা-পাঁচেক ছবি—টপ্ করিয়া একটা মস্ত বড় ফোঁটা শ্লেটের উপর আসিয়া পড়িল। একটা কলম লইয়া শুভদা আবার সেগুলি তেমনি সযত্নে বাঁধিয়া রাখিল। কারণ এগুলি মাধবের বড় যত্নের দ্রব্য তাহা সে জানিত।

নীচে আসিয়া শুভদা পত্র গ্রহণ করিল। ঘরে গিয়া খুলিয়া দেখিল, একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট। নিশ্চয় ভুল হইয়াছে; পিয়নকে ডাকিতে সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল, কিন্তু পিয়ন ততক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। বৌমানুষ, চিৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না—কাজেই নোট লইয়া ফিরিয়া আসিল। শুভদা মনে করিয়াছিল, আর একটু পরে সে আপনিই আসিবে। কিন্তু তাহা হইল না। সেদিনও আসিল না। কিংবা পরদিনও আসিল না। তখন শুভদা এ কথা সদানন্দকে জানাইল। সদানন্দ দেখিয়া শুনিয়া বলিল, ভুল হয় নাই। এ গ্রামে আপনার নামে আর কেউ নাই—হারাণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী—তখন এ আপনারই বটে, কিন্তু কলিকাতায় কে আপনার আছে?

কলিকাতায় আমার কেহ নাই।

পরদিন সদানন্দ ডাকঘরে সংবাদ লইয়া আসিয়া বলিল, অঘোরনাথ বসু, উকিল—কলিকাতা হইতে এ টাকা পাঠাইয়াছেন।

শুভদা বিস্মিত হইয়া কহিল, ও নামের কাহাকেও আমি চিনি না।

তবে?

শু। তুমি উপায় কর।

সদানন্দ হাসিয়া বলিল, উপায় আর কি করিব? টাকা যদি না লওয়া মত হয়, তাহা হইলে ফিরাইয়া দিন।

শু। বাবা, যখন ছেলেমেয়ে নিয়ে খাইতে পাই নাই, তখনো বোধ হয় এ টাকা নিতাম না। এখন কি দুঃখে টাকা নেব? এ আমার টাকা নয়, তুমি ফিরিয়ে দাও।

ভাবিয়া চিন্তিয়া সদানন্দ কহিল, আমি কলিকাতায় গিয়া সন্ধান লইব। এ টাকা এখন আপনি রাখিয়া দিন—যদি ফিরাইয়া দিবার হয়, ফিরাইয়া দিব।

শু। তুমি টাকা সঙ্গে লইয়া যাও—মত-অমত নাই—একেবারে ফিরাইয়া দিও। সম্ভব, তিনি আর কাহারো বদলে আমাকে পাঠিয়েছেন।

স। যা হয় সেখানে গিয়া স্থির করিব।

শু। তাই করিও।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আপনার প্রশস্ত কাছারিঘরে উকিলবাবু শ্রীঅঘোরনাথ বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। সম্মুখে টেবিলের অপর পার্শ্বে নারায়ণপুরের সুরেন্দ্রবাবু বসিয়া আছেন। টেবিলের উপর একরাশি মকদ্দমার কাগজপত্র রহিয়াছে; ব্যস্তভাবে দুইজনে তাহারি তদ্বির করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, অঘোরবাবু, বোধ হয় এ মকদ্দমা আমি জিতিতে পারিব না।

অ। এখনো কিছুই বলা যায় না।

সু। বলা বেশ যায়। ঠিক বুঝিতেছি মকদ্দমা হারিতেই হইবে।

অ। কিন্তু হাইকোর্টের উপরও ত আছে?

সু। আছে, কিন্তু ততদূর যাইবার ইচ্ছা নাই।

অ। তবে কি মালপুরের বিষয়টা ছাড়িয়া দিবেন?

সু। না দিয়া আর উপায় কি?

অ। বিস্তর আয় কমিয়া যাইবে।

সু। হাঁ, প্রায় অর্ধেক কমিবে।

অঘোরবাবু মৌন হইয়া রহিলেন। মনে মনে বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন, কারণ তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, সুরেন্দ্রবাবুর অনুমানই কালে সত্য হইয়া দাঁড়াইবে। এইসময় একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, বাহিরে একজন আপনার সহিত দেখা করিতে চান।

অঘোরবাবু তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, কে?

চিনি না। দেখে বোধ হয় কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

তবে বল্ গে যা এখন আমার সময় নেই।

কিছুক্ষণ পরে পুনর্বার সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তিনি যেতে চান না—বলেন বড় দরকার আছে।

অঘোরবাবু আরো একটু বিরক্ত হইলেন; কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন, এঘরেই ডাকিয়া পাঠাব কি?

ক্ষতি কি?

ভৃত্যকে তিনি সেইরূপ অনুমতি করিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গলদেশে যজ্ঞোপবীত, মস্তকে শিখা, কিন্তু কপালে ফোঁটাতিলক প্রভৃতি কিছুই নাই। অর্ধময়লা উত্তরীয় বসন, সাদা থান পরিধানে, পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্যন্ত ধূলা উঠিয়াছে। দুজনেই চাহিয়া দেখিলেন। অঘোরবাবু বলিলেন, বসুন।

ব্রাহ্মণ অদূরে চৌকির উপর স্থান গ্রহণ করিয়া বলিলেন, উকিলবাবু অঘোরনাথ বসু মহাশয়ের—

আমারই নাম অঘোরনাথ।

ব্রা। তবে আপনার নিকটেই প্রয়োজন আছে। যা বলিবার এইখানেই বলিব কি?

অ। স্বচ্ছন্দে বলুন।

তিনি তখন উত্তরীয়-বস্ত্র হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, এ টাকা শুভদা দেবীকে কি আপনি পাঠাইয়াছিলেন?

অঘোরবাবু তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আমিই পাঠাইয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হলুদপুরে হারাণ মুখুজ্যের বাটীতে শুভদা দেবীকে?

অ। হাঁ, তাই বটে।

ব্রা। কেন?

অ। মনিবের হুকুম।

ব্রা। মনিব কে?

অঘোরবাবু সুরেন্দ্রবাবুর পানে ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তাহা বলিতে নিষেধ আছে।

ব্রা। তবে এ টাকা ফিরাইয়া নিন। যাঁহাকে ইহা পাঠাইয়াছিলেন, তিনি গ্রহণ করিবেন না, আপনাকে তিনি চিনেন না এবং সম্ভবতঃ আপনার মনিবকেও চিনেন না। আমাকে এখানে সমস্ত সংবাদ লইয়া নোটখানা ফিরাইয়া দিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম আপনি বুঝি ভ্রম করিয়া একজনের স্থানে আর একজনের নাম লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

অঘোরবাবু হাসিলেন, বলিলেন, এতটা ভ্রম উকিলের হয় না।

ব্রা। না হোক, কিন্তু এখন প্রতিগ্রহণ করুন।

অ। তাহাও পারি না—মনিবের হুকুম ব্যতীত কিছুই করিব না।

ব্রা। তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ দিবেন, আমি অন্যদিন আসিয়া দিয়া যাব। তিনি উঠিতেছিলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আপনা হইতেই বলিলেন, মহাশয়ের নাম?

আমার নাম সদানন্দ চক্রবর্তী।

সুরেন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিলেন, আপনি এখানে কোথায় আছেন?

স। কোথায় থাকিব এখনো স্থির করি নাই; বরাবর এখানেই চলিয়া আসিয়াছিলাম এবং সম্ভবতঃ আজই ফিরিয়া যাইব।

সুরেন্দ্রনাথ অঘোরবাবুকে বলিলেন, এখন যাই, রাত্রে আবার আসিব। তাহার পর সদানন্দর পানে চাহিয়া বলিলেন, আপনার সহিত আমার কিছু কথা আছে।

স। বলুন।

সু। এখানে নহে। আমার বাসা নিকটেই, আপত্তি না থাকে ত চলুন সেখানেই যাই—তথায় সমস্ত বলব।

সদানন্দর তাহাতে আপত্তি ছিল না; তখন দুইজনে গাড়িতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। উপবেশনান্তে সদানন্দ কহিলেন, ইহার পূর্বে আপনাকে কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না—কিন্তু—কিন্তু—আপনি আমাকে কখন দেখিয়াছিলেন কি?

সু। না, দেখি নাই। কিন্তু আপনাকে জানি।

স। কিরূপে?

সু। বাসায় চলুন—সেখানেই বলিব।

অল্পক্ষণ পরে গাড়ি বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, আমিও ব্রাহ্মণ, বেলাও অধিক হইয়াছে—আপনি এখানে আহার করিলে ক্ষতি কি?

কিছু না।

তাহার পর আহারাদি শেষ করিয়া উভয়ে উপবেশন করিলে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, শুভদা দেবী দরিদ্র নয় কি?

স। দরিদ্র বটে; কিন্তু তাই বলিয়া—

সু। বুঝিয়াছি। তাই বলিয়া দান লইবেন কেন?

স। কতক তাই বটে; বিশেষ দাতার নাম না জানিতে পারিলে—

সু। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? যে দান করিয়াছে, সে-ই বলিতেছে, ভুল-প্রমাদ কিছুই ঘটে নাই। যোগ্য ব্যক্তিকেই দেওয়া হইয়াছে।

স। কে দান করিয়াছে?

সু। ধরুন, এখন অঘোরবাবুই—

স। অঘোরবাবুর কি অধিকার আছে?

সুরেন্দ্রবাবু ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, কিন্তু দান করিতে সকলেরি অধিকার আছে।

স। থাকিতে পারে, কিন্তু সকলেই গ্রহণ করে কি?

সু। করে না; কিন্তু যাহার চলে না সে?

সদানন্দ ঈষৎ বিরক্ত হইল; বলিল, শুভদা দেবীর এরূপ ভিক্ষা না লইলেও চলে।

সু। আজকাল বোধ হয় চলে, কিন্তু কিছুদিন পূর্বে চলিত কি?

স। সেকথার প্রয়োজন কি? আর আপনি এত জানিলেন কিরূপে?

সু। আমি অনেক কথা জানি। হারাণবাবু উপার্জন করেন না—অধিকন্তু আনুষঙ্গিক নানা দোষ আছে—যে আপনার স্ত্রী-পুত্র- পরিবার প্রতিপালন করে না, তাহার সংসার পরের সাহায্য ব্যতীত চলে কি?

সদানন্দ কিছু গোলমালে পড়িল, উপস্থিত কোনরূপ উত্তর করিতে পারিল না।

সুরেন্দ্রবাবু পুনরায় কহিলেন, হারাণবাবু এখন কি করেন?

স। কিছু না।

সু। বুঝিয়াছি। আপনার সাহায্যে তবে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়?

স। ভগবান সাহায্য করেন—আমি দরিদ্র।

সু। ছলনার বিবাহ হইয়াছে?

স। হইয়াছে।

সু। কোথায়? কাহার সহিত?

স। আমাদের গ্রামেই। শারদাচরণ রায়ের সহিত।

সু। মাধব কেমন আছে?

স। সে বাঁচিয়া নাই—অনেকদিন মরিয়া গিয়াছে।

সু। আহা! তাঁর বড় মেয়েটি এখন কোথায়?

সদানন্দ বিস্মিত হইয়া বলিল, কোথায় কিরূপ? সেও ত বাঁচিয়া নাই।

সু। বাঁচিয়া নাই? মরিল কিরূপে?

স। গঙ্গাজলে আত্মহত্যা করিয়াছিল।

সু। কেমন করিয়া জানিলেন? মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল কি?

স। মৃতদেহ ভাসিয়া উঠে নাই; কিন্তু তাহার পরিধেয় বস্ত্র গঙ্গাতীরে পাওয়া গিয়াছিল—তাহাতেই বোধ হয় আত্মহত্যা করিয়াছে। সু। সে বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ নাই?

স। কিছু না।

কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলেন; তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, আচ্ছা, মনে করুন, যদি এ-টাকা সে-ই পাঠাইয়া থাকে?

স। কে? ললনা?

সু। ললনা কে? তার নাম কি ললনা ছিল?

স। হাঁ।

সু। আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম, ললনাই বটে! ললনা, ছলনা দুই বোন,—না?

স। হাঁ।

সু। মনে করুন দেখি, যদি সে-ই এ টাকা পাঠাইয়া থাকে?

স। যে মরিয়াছে, সে?

সু। হাঁ, সে-ই। গঙ্গাতীরে তাহার বস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই যে সে মরিয়াছে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এখন যদি সে-ই পাঠাইয়া থাকে?

সদানন্দ বড় বিহ্বল হইল। কিছুক্ষণ অধোবদনে ভাবিয়া বলিল, সে বাঁচিয়া নাই; বাঁচিয়া থাকিলে পত্র লিখিত।

সু। পত্র লিখিতে যদি তাহার লজ্জা বোধ হয়?

স। আমি ললনাকে জানি। লজ্জার কাজ কখনো সে করিবে না—জীবিত থাকিয়া কখনো আত্মগোপন করিবে না!

সু। সে মরে নাই—বাঁচিয়া আছে; সে-ই টাকা পাঠাইয়াছে এবং প্রতি মাসে পাঠাইবে।

সদানন্দ আপনার কপাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল, আপনার নাম?

সুরেন্দ্রনাথ রায়।

নিবাস?

নারায়ণপুর।

স। আপনি হারাণবাবুর এত কথা কি করিয়া জানিলেন?

সু। ললনা বলিয়াছে।

স। ললনা বলে কেউ নাই—সে মরিয়াছে।

সু। মরে নাই—সে সুখে আছে।

স। সে স্বর্গে গিয়াছে—

সুরেন্দ্রবাবু চিৎকার করিলেন, সদানন্দবাবু, আর একটু দাঁড়ান—

আমি যাই—

দাঁড়ান—আর দুটো কথা—

যদি কখন দেখা হয় বলিবেন, সদাদাদা তাহাকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করিয়াছে—

তাঁর মাকে বলিবেন—

হাঁ—স্বর্গে গিয়াছে।

সদানন্দ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আর ফিরিল না—আর বসিল না।

সে চলিয়া গেলে সুরেন্দ্রনাথ বহুক্ষণাবধি নির্বাক নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলেন। কিছু দিবস পূর্বে হইলে বোধ হয় এখন হাসিতেন, কিন্তু আজ চক্ষুকোণে জল আসিয়া পড়িল। এইসময় বাহিরে ভৃত্য ডাকিয়া বলিল, বাবু, গাড়ি সাজাবে?

হাঁ, সাজাও।—ছিঃ ছিঃ—এমন বিষও মানুষ ইচ্ছা করিয়া খায়!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অনেক রাত্রি হইয়াছে, তথাপি মালতী আপনার কক্ষে বসিয়া 'সীতার বনবাস' পড়িতেছে। অনেক কাঁদিয়াছে, অনেক চোখ মুছিয়াছে, তথাপি পড়িতেছে। আহা! বড় ভাল লাগে—কিছুতেই ছাড়া যায় না।

এইসময় বাহিরে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বড় মোটা গলায় কে ডাকিল, ললনা!

মালতী শিহরিয়া উঠিল—হাতের 'সীতার বনবাস' নীচে পড়িয়া গেল।

ললনা!

মালতীর বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—কে?

এবার হাসিতে হাসিতে সুরেন্দ্রনাথ ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার ডাকিলেন, ললনা!

তুমি?

হাঁ, আমি; কিন্তু তুমি ধরা পড়িয়াছ। নাম জাল করিয়াছিলে কেন?

কৈ?

আবার মিছে কথা? তাহার শুষ্ক ওষ্ঠাধর চুম্বন করিয়া বলিলেন, সমস্ত শুনিয়া আসিলাম। ললনা ছিলে—মালতী হইয়া বসিয়াছ।

কোথায়?

কলিকাতায়।

কলিকাতায় আমাকে ত কেহ জানে না।

সু। সেখানে কেহ তোমাকে জানে না বটে, কিন্তু যে জানে সে হলুদপুর হইতে আসিয়াছিল।

মা। কে?

সু। তোমার সদাদাদা সেই নোট ফিরাইয়া দিতে অঘোরবাবুর নিকট আসিয়াছিলেন।

মা। নোট ফিরাইয়া দিতে?

সু। হাঁ—

মা। সদাদাদা?

সু। সে-ই।

মালতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, কথা কও না যে?

মা। সদাদাদা কেমন আছেন?

সু। ভাল আছেন। তোমার মা ভাল আছেন—তাঁর অবস্থা এখন আর মন্দ নয়, তাই তোমার দান গ্রহণ করিবেন না। সদানন্দবাবু তাঁহাদের অবস্থা ফিরাইয়া দিয়াছেন।

মা। আমার নাম ললনা—সে কথা কেমন করিয়া জানিলে?

সু। সদানন্দ বলিয়াছেন। তাঁহারা সকলে জানেন তুমি জলে ডুবিয়া আত্মঘাতী হইয়াছ।

মালতী নিশ্বাস ফেলিল।

সু। কিন্তু আমি বলিয়াছি যে তুমি বাঁচিয়া আছ এবং সুখে আছ।

মা। তা কেন বলিলে?

সু। তবে কি মিথ্যা বলিব? তুমি বাঁচিয়াও আছ, আর আমার বোধ হয় সুখেও আছ—

সুখে নাই কি?

মা। আছি—কিন্তু সেকথা কি সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?

সু। নাঃ আমি আপনি বলিয়াছি এবং তোমার মাকেও একথা বলিতে বলিয়াছি।

মা। আমি টাকা পাঠাইয়াছিলাম—তাহাও বলিয়াছ কি?

সু। বলিয়াছি।

মা। তুমি আমার মাথা খাইয়া আসিয়াছ। সে পাগল, একথা গ্রামময় বলিয়া বেড়াইবে। যদি তাহাদিগের নিকট মরিয়াই ছিলাম, তবে কেন বাদ সাধিয়া আবার বাঁচাইলে?

সুরেন্দ্রনাথ দুঃখিতভাবে মৃদু হাসিলেন; তাহার পর বলিলেন, যাহাকে তোমরা পাগল মনে করিতে, সে বাস্তবিক একতিলও পাগল নয়। হয়ত সে কখন পাগল ছিল, কিন্তু সেদিন তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহার দ্বারা হলুদপুরে তুমি কখন বাঁচিবে না। তুমি যখন আত্মগোপন করিয়াছ, সে কখন তাহা প্রকাশ করিবে না।

মা। কেমন করিয়া জানিলে?

সু। জানিয়াছি! যখন, তোমার জীবিত থাকার কথা তোমার মাকে জানাইতে বলিলাম, সে বলিল—ললনা লজ্জার কাজ কখন করিবে না, আত্মগোপন কখন করিবে না—সে বাঁচিয়া নাই, মরিয়াছে। আমি বলিলাম, সে সুখে আছে। সে বলিল, সে স্বর্গে গিয়াছে। আমি বলিলাম, সদানন্দবাবু, আর একটু দাঁড়ান। সে বলিল, আমি যাই—যদি কখন তার দেখা পান, বলিবেন, সদাদাদা তাহাকে অনেক আশীর্বাদ করিয়াছে। মালতী, আমি ঠিক বুঝিয়াছিলাম; যে বিষ আমি খাইয়াছি—সে বিষ সেও খাইয়াছে। আমার সুধা হইয়াছে—তাহার প্রাণহন্তারক হইয়াছে।

মালতী অধোবদন হইয়া শুনিতেছিল; বড় কাঁদিবার ইচ্ছা হইতেছিল—কিন্তু লজ্জা করিতেছিল।

আর একটা সুখবর—তোমার ছলনার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

মালতী মুখ তুলিয়া বলিল, হইয়াছে? কোথায়, কার সহিত?

ঐ গ্রামেই। শারদাচরণ না কে—তাহারি সহিত।

মালতী বুঝিতে পারিল। মনে মনে তাহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বলিল, বিবাহ কারত সে-ই করিবে, তাহা কতক জানিতাম।

সু। কেমন করিয়া জানিলে? পূর্ব হইতে কি কথাবার্তা ছিল?

মা। না—কথাবার্তা কিছুই ছিল না—তবে আমি এক সময়ে ছলনাকে বিবাহ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন পিতার ভয়ে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই, পরে আমি মরিয়াছি—এই ভাবিয়া দয়া করিয়া বোধ হয় বিবাহ করিয়াছেন।

সু। পিতার ভয় কেন?

মা। তিনি অতিশয় অর্থপিপাসু লোক। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, পুত্রের বিবাহ দিয়া কিছু অর্থলাভ করিবেন।

সু। তাহা বদলাইল কেন? তোমার পিতা নিশ্চয়ই অর্থ দিতে পারেন নাই।

মা। সম্ভব। মালতী মনে ভাবিল, যে ভালবাসায় তুমি ধরা দিয়াছ শারদাচরণের সেই ভালবাসায় শারদাচরণের পিতাও ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিল না।

মালতী চিন্তা করিবার আজ অনেক দ্রব্য পাইয়াছে, তাই বেশি কথা কহিতে ভাল লাগিতেছিল না; কিন্তু মনে পড়িল মাধবের কথা। বলিল, মাধব—তার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

সে ভাল আছে।

মালতীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল। সে রাত্রে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে জাগিয়া রহিল, অনেক কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিল। ভাবিল, সদানন্দ আসিয়াছিল—টাকা ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল; আর তাহাদের প্রয়োজন নাই। আমিও আর পাঠাইব না। তারপর মনে করিল—শারদাচরণ! পূর্বে শত ধন্যবাদ দিয়াছিল, এখন সহস্র ধন্যবাদ তাহাকে মনে মনে দিল—মনে মনে বলিল, তুমি আমার অপরাধ লইও না, তখন তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আর কখন তোমাকে হয়ত দেখিতে

পাইব না, কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন এ দয়া ভুলিব না। অন্তরে চিরদিন তোমাকে ভক্তি করিয়াছি, চিরদিন করিব।

সে খুঁজিয়া দেখিল, শারদার অস্পষ্ট ছায়া এখনও সে হৃদয় হইতে পূর্ণ বিলীন হইয়া যায় নাই। আজ আরো স্পষ্টীকৃত হইল। মনে মনে বলিল, স্বামী বলেন—সে সদানন্দ; কিন্তু সে শারদা!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে সদানন্দ ফিরিয়া আসিল। সমস্ত পথটা সে বড় অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছিল। পথে যে-কেহ ডাকিয়া বলিল, দাদাঠাকুর কোত্থেকে? দাদাঠাকুর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ'।—কোথায় গেছলে? সদানন্দ দাঁড়াইয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, বাড়ি যাচ্ছি। তাহার হালের গরু ততক্ষণ একজনের বেগুনক্ষেতে ঢুকিয়াছে, সে গালি দিতে দিতে তাহার পশ্চাৎ ছুটিল, সদানন্দও পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। সে গরু ফিরাইয়া আনিয়া আপনা-আপনি বলিল, ক্ষেপার মনটা আজ দেখচি বড় ভাল নয়, বেশ লোকটি!

রামুমামা নন্দ ময়রার দোকানঘরের চৌকাঠে ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছিলেন, একপা ধূলা সদানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, ও সদানন্দ, চার-পাঁচদিন তোমাকে যে দেখিনি, ছিলে কোথা?

সদানন্দ না ফিরিয়া পশ্চাৎদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, ওখানে!

কোথায়? বামুনপাড়ায়?

হুঁ।

এতদিন ধরে?

হুঁ। সদানন্দ হনহন করিয়া চলিতে লাগিল।

রামুমামা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, দূর, কি যে বলে কিছু বোঝা যায় না।

সদানন্দ সেকথা শুনিল না বা শুনিতে পাইল না, একেবারে শুভদার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নোটখানা নিকটে রাখিয়া বলিল, কোন সন্ধান হইল না।

শুভদা বলিলেন, তবে মিথ্যে ক্লেশ পাইলে।

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল।

শুভদা আবার বলিলেন, তবে এ টাকা লইয়া কি করিব?

স। আপনার যাহা ইচ্ছা। টাকা আপনার ইচ্ছা হয় বিলাইয়া দিন, নাহয় রাখিয়া দিন, যদি কখন সন্ধান পাওয়া যায়, ফিরাইয়া দিবেন।

শুভদা অগত্যা তাহা বাক্সবন্ধ করিয়া রাখিল।

সদানন্দ বলিল, হারাণকাকা কোথায়?

শুভদা পার্শ্বের ঘর দেখাইয়া বলিল, শুইয়া আছেন।

কোথাও যান নাই?

গিয়াছিলেন—এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বড় ঝড়বৃষ্টি করিয়া আসিল। শুভদা সকাল সকাল রন্ধনাদি শেষ করিয়া লইল। হারাণবাবু আহারাদি করিয়া বলিলেন, কিছু পয়সা দাও।

আজ আর কোথাও যেও না; আকাশে মেঘ কোরে আছে, রাত্রে যদি জল হয়?

হোলেই বা।

তা হ'লে ফিরে আসতে কষ্ট হবে।

কিছু না। আজ অনেক কাজ আছে। যেতেই হবে।

কাজ যাহা ছিল শুভদা তাহা জানিত। তথাপি কহিল, আজ একাদশী; ঠাকুরঝির আবার অসুখ হয়েচে—অঘোরে পড়ে আছেন।

হারাণ তাহা শুনিল না। ট্যাঁকে পয়সা গুঁজিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া, তালি-দেওয়া চটি-জুতা হাতে লইয়া, কোঁচা গুঁজিয়া জল-কাদার মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলেন। শুভদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, স্বভাব!

সে যথার্থই অনুমান করিয়াছিল; রাত্রি একপ্রহর না হইতেই আবার বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আজকাল প্রতি রাত্রে শুভদার অল্প অল্প জ্বর হইত; কিন্তু একথা কাহাকেও বলা দূরে যাউক, সে একরূপ নিজেকেই জানিতে দিত না। রাত্রে যখন শীত করিয়া জ্বর আসিত, শুধু তখনই মনে পড়িত।

বৃষ্টিপতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শীত বোধ হইতে লাগিল, হাতের নিকট যাহা পাইল তাহাই টানিয়া গায়ে দিতে লাগিল। অনেক রাত্রে শুভদার তন্দ্রাবোধ হইল। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে, কিন্তু অনেক কমিয়া আসিয়াছে। ক্লান্ত শরীরে তন্দ্রার মোহে শুভদার বোধ হইল, কে যেন দ্বার ঈষৎ ফাঁক করিয়া জীর্ণ অর্গলটা খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহার পরেই খট্ করিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সে চক্ষু চাহিয়া সেই আলোকে দেখিল, একজন লোক কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, তাহার হস্তে বংশযষ্টি, সমস্ত বদন ও অঙ্গ মসীলিপ্ত, তাহার উপর শাদা-শাদা চুনের ফোঁটা। শুভদা শিহরিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, কে গো!

চুপ! সে বজ্রগম্ভীরস্বরে শুভদা আতঙ্কে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সে বার-দুই ঠকঠক করিয়া লাঠির আওয়াজ করিয়া শয্যার নিকটে আসিয়া কহিল, তোর বাক্সর চাবি দে। গলাটা বড় মোটা, ভারী। হঠাৎ শুনিলে মনে হয় বুঝি বা সে চেষ্টা করিয়া এরূপ মোটা গলায় কথা কহিতেছে।

শুভদা কথা কহিল না।

সে আবার সেইরূপ স্বরে, লাঠিটা আর একবার শানের উপর ঠুকিয়া বলিল, চাবি দে, না হলে গলা টিপে মেরে ফেলব।

এবার শুভদা উঠিয়া বসিল, বালিশের নীচে হইতে চাবির থোলো লইয়া নিকটে ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে শান্তভাবে বলিল, আমার বড় বাক্সের ডান দিকের খোপে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে, তাই নিও—বাঁ দিকে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ আছে, তাতে যেন হাত দিও না। যেরূপ শান্তভাবে সে কথাগুলি বলিল, তাহাতে বোধ হয় না যে, আর তাহার তিলমাত্রও ভয় আছে।

চুনকালি-মাখা পুরুষ চাবি লইয়া বড় বাক্স খুলিল, বাম দিকে মোটে হস্তনিক্ষেপ করিল না, ডান দিকের খোপ হইতে নোট লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া ফেলিল। শুভদার কথামত সে যেরূপ স্বচ্ছন্দে বাক্স খুলিল এবং ডান দিকের খোপের সন্ধান করিয়া লইল তাহাতে বোধ হয় যেন এসকল তাহার বিশেষ জানাশুনা আছে।

সে চলিয়া যাইবার সময় শুভদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল; মৃদু মৃদু কহিল, নোটে বোধ হয় নাম লেখা আছে, নম্বর দেওয়া আছে—একটু সাবধানে ভাঙ্গাইয়ো।